তোমাদের জন্য ভালোবাসা

হুমায়ূন আহমেদ

। সায়েন্স ফিকশন সমগ্র ।

★2022★

সূচিপত্র

১. সবাই এসে গেছেন 2
২. গাড়ি ছেড়ে দিল. 15
৩. আমি স্রুরা 24
৪. ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন 33
৫. বইটি অর্ধসমাপ্ত 75
৬. ভালোবাসার নীল আলো. 86

১. সবাই এসে গেছেন

সবাই এসে গেছেন।

কালো টেবিলের চারপাশে সাজান নিচু চেয়ারগুলিতে চুপচাপ বসে আছেন তাঁরা। এত চুপচাপ যে তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসবে। কাল রাতের বেলা ভয়ানক জরুরী ছাপমারা লাল রঙের চিঠি গিয়েছে সবার কাছে। সেখানে লেখা, আসন্ন মহাসংকট নিয়ে আলোচনা, আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণাগার-প্রধান এস, মাথুরের সই করা চিঠি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত মহামান্য ফিহাও হয়তো হাজির থাকবেন এই জরুরী বৈঠকে। চিঠিতে অবশ্য এই কথা উল্লেখ নেই। কখনো থাকে না। অতীতে অনেকবার বিজ্ঞানী সম্মেলনের মহাপরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসেন নি। বলে পাঠিয়েছেন, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আসতে পারছি না, দুঃখিত। কিন্তু আজ তাঁকে আসতেই হবে। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা তো আর রোজ রোজ দেখা দেয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও এক-আধা বার হয়। কিনা কে জানে! এ সময়ে ফিহার মত বিজ্ঞানী তাঁর অভ্যাসমতো শুয়ে শুয়ে গান শুনে সময় কাটাবেন, তাও কি হয়!

আমার মনে হয় মাথুর এসে পড়তে আর দেরি নেই। যিনি কথা বললেন, সবাই ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, নীরবতা ভাঙার জন্যই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়

এ কথাগুলি বলা হয়েছে। বক্তার দিকে তাকিয়ে দুএকজন ভ্রূ কোঁচকালেন। বক্তা একটু কেশে বললেন,

কাল কেমন ঝড় হয়েছিল দেখেছেন? জানালার একটা কাঁচ ভেঙে গেছে আমার।

কথার উত্তরে কাউকে একটি কথাও বলতে না শুনে তিনি অস্বস্তিতে আঙুল মটকাতে লাগলেন। মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন।

ঘরটি মস্ত বড়। প্রায় হলঘরের মতো। জরুরী পরিস্থিতিতে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানীর বসার জায়গা আছে। আজ অবশ্য এসেছেন। আটাশ জন। বসবার ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকক্ষের পাশের ফাঁকা জায়গাটায়। পর্দা টেনে নিয়ন্ত্রণকক্ষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের ঘর। শীতকালে জমে যাওয়া হ্রদের জলের মত মসৃণ মেঝে কালো পাথরের ইমিটেশনে তৈরি দেয়াল, দেখা যায় না। এমন উঁচুতে ছাদ।

যেখানে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন, তার পাশের ঘরটিতে মহাশূন্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে-যাওয়া স্টেশন, অভিযাত্রী দল, সন্ধানী দলের সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে কম্পিউটার সিডিসি। বিজ্ঞানীদের হাজার বছরের সাধনায় তৈরি, মানুষের মস্তিকের নিওরোনের ১নিখুত অনুকরণে তৈরি নিওরোন যার জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। কে বলবে, আজকের এ বৈঠকে হয়তো কম্পিউটার সিডিসিও অংশ গ্রহণ করবে, নয় তো ঠিক তার পাশের ঘরেই বৈঠক বসোনর কোনো কারণ নেই।

এস. মাথুরের আসার সময় হয়েছে ঠিক দেড় ঘণ্টা আগে কথাগুলি বলে পদার্থবিদ স্রুরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অল্প বয়সে অকল্পনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি সম্মানসূচক একটি লাল তারা পেয়েছেন। তাঁর আবিস্তৃত দ্বৈত অবস্থানবাদ নিয়ে তিন বৎসর ধরেই ক্রমাগত গবেষণা হচ্ছে। সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন দ্বৈত অবস্থানবাদ স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা স্রুরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজন।... স্রুরা অল্প কাঁপছিলেন। তাঁর টকটকে ফস মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের উপর এসে পড়া লালচে চুলগুলি বা হাতে সরিয়ে তিনি দৃঢ় গলায় বললেন,

একটি মিনিটও যেখানে আমাদের কাছে দামী, মাথুর কি করে সেখানে দেড় ঘণ্টা দেরি করেন ভেবে পাই না।

বিরক্তিতে স্রুরা কাঁধ ঝাকাতে লাগলেন! প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, মাথুরের মনে রাখা উচিত, সমস্যাটি মারাত্মক।

বিজ্ঞানীরা নড়েচড়ে বসলেন। সমস্যাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক, হয়তো ইতিমধ্যেই তা তাদের গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই ঘর, এই গোল কালো রঙের টেবিল, ঘরের ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাস সমস্তই বলছে,

সময় খুব কম, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের ভয়-পাওয়া মুখের ছায়া পড়েছে। ঘরের কালো দেয়ালে। বুকের ভেতর শিরশির করা অনুভূতি নিয়ে তাঁরা নীরবে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো ধারণা বদলে দেয়ার জন্যে মহাপুরুষদের মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মান। কালজয়ী সে সব অতিমানব মানুষের জ্ঞানের সিঁড়ি ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে লাফিয়ে ধারণাতীত উঁচু ধাপে নিয়ে যান। বিধাতার মতো ক্ষমতাধর এ সমস্ত মানুষেরা বহু যুগে এক-আধা জন করে জন্মান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ শুরু হয় তখন। মানুষের আদিমতম কামনা, দৃশ্য—অদৃশ্য যাবতীয় বিষয় আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলব, অজানা কিছুই থাকবে না, অদেখা কিছুই থাকবে না। কোনো রহস্য থাকবে না।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়টা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার কাল চলছে। পুরনো ধারণা বদলে গিয়ে নতুন নতুন সূত্র ঝড়ের মতো এসে পড়ছে। যে সমস্ত জটিল রহস্যের হাজার বৎসরেও সমাধান হয় নি, অতীতের তারৎ বিজ্ঞানীরা যা অসহায়ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, তাদের সমাধানই শুধু হয় নি—-সে সমাধানের পথ ধরেই নতুন সূত্রাবলী, নতুন ধারণা কম্পিউটারের মেমরি সেলে সঞ্চিত হতে শুরু হয়েছে। জন্ম হয়েছে ফিহার মতো মহা আঙ্কিকের, যিনি তাঁর তুলনাহীন প্রতিভা নিয়ে ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছেন মাত্র ছবিশ বৎসর বয়সে। জন্ম হয়েছে পদার্থবিদ স্রুরার, পদার্থবিদ এস. মাথুরের। মানুষের তৈরি কৃত্রিম নিওরোন নিয়ে তৈরি হয়েছে মানবিক আবেগসম্পন্ন কম্পিউটার সিডিসি। গ্রহ থেকে গ্রহে, মহাকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কে বলে জ্ঞানের শেষ নেই, সীমা নেই? মানুষের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তেই হবে জ্ঞানকে। বিজ্ঞানীদের পিছু ফেরবার রাস্তা নেই।–আরো জান, আরো বেশি জান।

এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনি আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ; এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের একপাশে পড়ে থাকা ছোট্ট একটি নীল রঙের গ্রহ। চারপাশে উজ্জ্বল ধোঁয়াটে রঙের ছায়াপথের

মাঝামাঝি গ্রহ একটি। একটি হঠাৎ আবিষ্কার। বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাকাশ গবেষণামন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল WGK-166, একটি সাদা বামন নক্ষত্রকে, যা দ্রুত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে প্রবল বিস্ফোরণে গুড়িয়ে যাবার জন্যে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন সাদা বামন নক্ষত্র৮ থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণ–তেজের প্রায় ষাট ভাগ কেউ যেন শুষে নিচ্ছে। এই প্রকান্ড ক্ষমতাকে কে টেনে নিতে পারে? অন্য কোনো গ্রহের কোনো উন্নত প্রাণী কি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করছে? যদি তা-ই হয় তবে সে প্রাণী কত উন্নত?

আবিষ্কৃত হল টাইফা গ্রহ।

বৃহস্পতির কাছাকাছি মহাজাগতিক স্টেশন নিনুপ-৩৭-এর অধিনায়ক টাইফার অনন্যসাধারণ আবিষ্কারক। সেই স্টেশনের সবাই অতি সম্মানসূচক দুই নীল তারা উপাধি পেলেন।

টাইফা গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগল এক বৎসর। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা হকচাকিয়ে গেলেন। টাইফা গ্রহের গণিতশাস্ত্রের খবর আসতে লাগল। বিক্ষিত বিজ্ঞানীরা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সমস্তই তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচরে। সেখানে সময় বলে কি কিছুই নেই? সময়কে সব সময় শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? বস্তু বলে কি কিছুই নেই? বস্তুকে শূন্য ধরা হচ্ছে কেন? শক্তিকে দুই মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করছে কেন?

মহা আঙ্কিক ফিহা, পৃথিবীর সব অঙ্কবিদরা নতুন গণিতশাস্ত্রের নিয়মাবলী পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভূতুড়ে সব গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, কোথেকে কী হচ্ছে? তাদের ফলাফল হিসেবে মহাশূন্যে কোথাও কোনো বস্তু নেই। চারদিকে অনন্ত শূন্য! মানুষ মহাজাগতিক

শক্তির একটি আংশিক ছায়া। তাহলে আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আমাদের অনুভূতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম, ভালোবাসা সমস্তই কি মিথ্যা? ছায়ার উপরেই জন্ম-মৃত্যু?

পৃথিবীর খবরের কাগজগুলিতে আজগুবি সব খবর বেরুতে লাগল। কেউ কেউ লিখল, টাইফা গ্রহের মানুষেরা পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে। কেউ লিখল, তারা পৃথিবীতে তাদের ঘাঁটি বানাবার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কেউ লিখল কি সুক্রানীদের মাথা গুলিয়ে ফেলার জন্যে তারা আজগুবি সব তথ্য পাঠাচ্ছে। গুজবের পিঠে ভয় করেই গুজব চলে। টাইফা গ্রহ নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিককল্পকাহিনী লেখা হতে থাকল। দুজন পরিচালক এই নিয়ে থ্রী ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করলেন। ছবির নাম নরক থেকে আসছি। কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছড়িয়ে পড়ল, টাইফা গ্রহের বিজ্ঞানীরা নাকি পৃথিবীর বিজ্ঞান-পত্নী সিরানেম এসে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাশূন্য-গবেষণা বিভাগ, খাদ্য-উৎপন্ন বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাধ্য হয়ে এস. মাথুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জনসাধারণকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে। অমূলক ভয়ভীতি সরিয়ে দিয়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিজ্ঞান–পল্লী সিরানে সেবারই সর্বপ্রথম অবিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হলেন।

বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি,–

বিজ্ঞান-পল্লী সিরানে সর্বপ্রথম নিমন্ত্রত অতিথিরা, আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। শুরুতেই টাইফা গ্রহ সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় ধারণার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। টাইফা গ্রহ নিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করুন, ছবি তৈরি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। নরক থেকে আসছি ছবিটা আমার নিজেরও অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

গ্যালারিতে বসা দর্শকরা এস, মাথুরের এই কথায় হৈ হৈ করে হাততালি দিতে লাগলেন। তালির শব্দ কিছুটা কমে আসতেই এস. মাথুর। তাঁর নিচু ও স্পষ্ট কথা বলার বিশেষ ভঙ্গিতে আবার বলে চললেন, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা উন্নত ধরনের প্রাণীর সন্ধান টাইফা গ্রহে পেয়েছি।

এক জন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, তারা কি দেখতে মানুষের মতো?

তারা দেখতে কেমন তা দিয়ে আমার বা আপনার কারো কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তারা নিঃসন্দেহে উন্নত জীব। তারা ওমিক্রন রশ্মির সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা ওমিক্রন রশ্মির যে সংকেত পাঠাচ্ছি, তা তারা বুঝতে পারছে এবং তারা সেই সংকেতের সাহায্যেই আমাদের খবর দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে সেই সংকেতে খবর পাঠান নিঃসন্দেহে উন্নত শ্রেণীর জীবের কাজ।

হলঘর নিঃশব্দ হয়ে এস. মাথুরের কথা শুনছে। শুধু কয়েকটা মুভি ক্যামেরার সাঁ সাঁ ছট ছট শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এস. মাথুর বলে চললেন, আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, টাইফা গ্রহ গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রাবলী সম্পর্কে যা বলতে চায় তা হতে পারে না, তা অসম্ভব।

কথা শেষ না হতেই নীল কোট পরা এক সাংবাদিক বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, চেঁচিয়ে বললেন, কেন হতে পারে না? কেন অসম্ভব? আমরা বুঝতে পারছি না বলে?

এস. মাথুর বললেন, তাদের নিয়মে সময় বলে কিছু নেই। এক জন অনায়াসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ অসম্ভব ও হাস্যকর।

সাংবাদিক চড়া গলায় বললেন, কেন হাস্যকর? হাজার বছর আগেও তো পৃথিবীতে টাইম মেশিন নিয়ে গল্প চালু ছিল।

এস. মাথুর বললেন, গল্প ও বাস্তব ভিন্ন জিনিস। আপনি একটি গল্পে পড়লেন যে একটি লোক হঠাৎ একটি পাখি হয়ে আকাশে উড়ে গেল। বাস্তবে আপনি সে রকম কোনো পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারেন না। পারেন কি?

কথা শেষ না হতেই দর্শকরা হোঃ হেঃ করে হেসে উঠল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাততালি পড়তে লাগল। সাংবাদিক লাল হয়ে বললেন, আমি পাখি হবার কথা বলছি না। আপনি কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

এস. মাথুর হাসিমুখে বললেন, না, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি না। টাইম মেশিনের কল্পনা কতটুকু অবাস্তব তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন। একটা টাইম মেশিন তৈরি করলাম, মেশিনে চড়ে আমরা চলে গেলাম। অতীতে, যখন আপনার জন্মই হয় নি। আপনার বাবার বয়স মাত্র বার। মনে করুন। আপনার সেই বার বৎসর বয়সের বাবাকে আমি খুন করে আবার টাইম মেশিনে চড়ে বর্তমানে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি আপনি সিরান-পল্লীতে

দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুনছেন। অথচ তা হতে পারে না। কারণ আপনার বাবা বার বৎসর বয়সে মারা গেছেন। অতএব আপনার জন্মই হতে পারে না।

সাংবাদিক বললেন, আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথাবাত শোনা গেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মহামান্য ফিহা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, দুর্লভ তিন লাল তারা সম্মানের অধিকারী, ত্রিমাত্রিক যৌগিক সময় সমীকরণের নির্ভুল সমাধান দিয়ে যিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে রেখেছেন। ফিহা মাথা নিচু করে হেটে গেলেন মাথুরের কাছে, বললেন, আমি কিছু বলব।

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল। ফিহা বলে চললেন, কাল আমি সারারাত ঘুমুতে পারি নি, আমার একটা পোষা বেড়ালছোনা আছে, সাদা রঙের, ধবধবে সাদা, বিলিয়ার্ড বলের মতো। ওর কী একটা অসুখ করেছে, সারারাত বিরক্ত করেছে আমাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে ঘুমুতে গেছি, হঠাৎ মনে হল টাইফা গ্রহের বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নির্ভুল। আচমকা মনে হল, সময় সংক্রান্ত আমার যেসব সূত্র আছে, সেখানে সময়কে শূন্য রাখলেও উত্তর নির্ভুল হয়, শুধু বস্তুকে ভিন্ন খাতায় নিয়ে যেতে হয়। আমি দেখাচ্ছি করে।

ফিহা ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে চলে গেলেন। একটির পর একটি সূত্র লিখে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অঙ্ক কষে চললেন। পরবর্তী পনের মিনিট শুধু চকের খসখস শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। ফিহা এক সময় বোর্ড ছেড়ে ডায়াসে উঠে এসে বললেন, সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করি? দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেন নি কিছুই। শুধু অঙ্ক কষার ধরন–ধারণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সবাই মাথা নাড়ালেন, যেন খুব বুঝতে পেরেছেন। ফিহা বললেন, এখন মুশকিল হয়েছে কি জানেন? তারা এত উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে যে তাদের কোনো

কিছুই এখন আর আমাদের ধারণায় আনা সম্ভব নয়। তাদের গণিত বলুন, তাদের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা–কিছুই নয়।

এবার বিজ্ঞানীদের ভিতর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, কেন সম্ভব নয়?

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, বোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ যেমন উন্নত, পিপীলিকাও তার স্কেলে অগৎি তার প্রাণিজগতে উন্নত। এখন মানুষ কি পারবে পিপীলিকাকে কিছু শেখাতে? গণিত শেখাতে পারবে? পদার্থবিদ্যা শেখাতে পারবে? পিপীলিকার আগ্রহ যতই থাকুন না কেন।

সভাকক্ষে তুমুল হাততালি পড়তে লাগল। এস. মাথুর। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনার হৈচৈ করবেন না। এইমাত্র নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে একটা মারাত্মক খবর এসেছে। আজকের অধিবেশন এই মুহূর্তেই শেষ।

এস. মাথুর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। যিনি তাঁকে এসে কানে কানে খবরটি দিয়েছেন তিনিও ঘনঘন জিব বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন।

মারাত্মক খবরটি কী? আমরা জানতে চাই। দর্শকরা চেঁচাতে লাগলেন। বসে থাকা বিজ্ঞানীরাও উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে।

মাথুর ভীত গলায় বললেন, কিছুক্ষণ আগে নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে জানান হয়েছে, হঠাৎ করে ভোজবাজির মতো টাইফা গ্রহটি হারিয়ে গেছে। কোনো বিস্ফোরণ নয়, কোনো সংঘর্ষ নয়, হঠাৎ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। যেখানে গ্রহটি ছিল, সেখানে এখন শূন্যতা ছাড়া আর

কিছুই নেই। আপনারা দশ মিনিটের ভেতর হলঘর খালি করে চলে যান। এক্ষুণি বিজ্ঞানীদের বিশেষ জরুরী বৈঠক বসবে। সভাপতিত্ব করবেন। মহামান্য ফিহি।

ফিহা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার এক্ষুণি বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। বেড়ালছানা রাত থেকে কিছু খায় নি। তাকে থুকোজ ইন্টারভেনাস দিতে হবে।

মাথুর বললেন, আপনি চলে গেলে কী করে হবে?

ফিহা বললেন, আমি থাকলেই বুঝি সেই গ্রহটা আবার ফিরে আসবে?

সন্ধ্যাতেই আভ্যন্তরীণ বেতার, বহির্বিশ্ব বেতার থেকে জরুরী নির্দেশাবলী প্রচারিত হল–

আমি বিজ্ঞান পরিষদের মহাপরিচালক এস. মাথুর বলছি।

এই মুহূর্তে থেকে পৃথিবীর উপনিবেশ মঙ্গল ও চন্দ্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় মহাজাগতিক স্টেশনে চরম সংকট ঘোষণা করা হল। টাইফা গ্রহ যে রকম কোনো কারণ ছাড়াই মহাশূন্যে মিশে গেছে, তেমনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রও মিশে যাচ্ছে। আমাদের কম্পিউটার সিডিসি কত পরিধি, কোন পথে এবং কত গতিতে এই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তা বের করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে এই গতিপথ চক্রাকার। তা টাইফা গ্রহ থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হবে। দুভাগ্যক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি এই আওতায় পড়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবী আর এক বৎসর তিন মাস পনের দিন পর এই দুভাগ্যের সম্মুখীন হবে। বিজ্ঞানীরা কী করবেন তা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। আপনাদের প্রতি নির্দেশ–

এক, আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হলে এই বিপদ থেকে যখন রক্ষা পাওয়া যাবে না, তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাভ কী?

দুই, যার যা করণীয় তিনি তা করবেন।

তিন. কোনো প্রকার গুজব প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সব সময় আপনাদের সঙ্গেই আছেন। যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে হাসিমুখে বরণ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবু বলছি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা হারাবেন না।

কালো টেবিলের চারপাশে নিচু চেয়ারগুলিতে বিজ্ঞানীরা বসে আছেন। পদার্থবিদ স্রুরা বললেন, আমরা কি অনন্তকাল এখানে বসে থাকব? এস. মাথুর যদি পাঁচ মিনিটের ভেতর না আসেন। তবে আমি চলে যাব।

ঠিক তক্ষুণি এস. মাথুর এসে ঢুকলেন। এক রাতের ভিতরেই তাঁর চেহারা বদলে গিয়ে কেমন হয়ে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, গালের চামড়া ঝালে পড়েছে। কোনো রকমে বললেন,

আমি দুঃখিত, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম ফিহাকে আনতে। তিনি কিছুতেই আসতে রাজি হলেন না। প্রেইরি অঞ্চলে চলে গেছেন হাওয়া বদল করতে। এত বড় বিপদ, অথচ–।

স্রুরা মুখ বিকৃত করে বললেন, ওর প্রাণদন্ড হওয়া উচিত, যতবড় প্রতিভাই হোক, প্রাণদন্ডই তার যোগ্য পুরস্কার। মাথুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

২. গাড়ি ছেড়ে দিল

হাতলে হাত রাখবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

এত অল্প সময়ে কী করে যে গতি এমন বেড়ে যায় ভাবতে ভাবতে লী বাতাসের ধাক্কা সামলাতে লাগল। হাতল খুব শক্ত করে বা আছে, তবু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। বা হাতে মস্ত একটা ব্যাগ থাকায় সে হাতটা অকেজো। দেরি করবার সময় নেই, টুরিষ্ট ট্রেনগুলি অসম্ভব গতিতে চলে। কে জানে হয়তো এরই মধ্যে ঘণ্টায় দুশো মাইল দিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে হাতের কালো ব্যাগটা ছুটে বেরিয়ে যাবে,।

এই মেয়ে, ব্যাগ ফেলে দু হতে হাতল ধর।

বুড়োমতো একজন ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠিক কখন যে তিনি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, লী লক্ষই করে নি। সে চেঁচিয়ে বলল, ব্যাগ ফেলা যাবে না। আপনি আমার কোমরের বেল্ট ধরে টেনে তুলুন না। দয়া করে।

লীর ধাতস্থ হতে সময় লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ধন্যবাদ। আরেকটু দেরি হলে উড়েই যেতাম।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। লওজ্জতভাবে বললেন, এই কামরার-বিপদ সংকেতের বোতামটা আমি খুঁজে পাই নি, পেলে এত অসুবিধা হত না।

ঐ তো বোতামটা, কী আশ্চর্য, এটা দেখেন নি!

উঁহু। বুড়ো মানুষ তো।

লীর মনে হল এই লোকটি তার খুব চেনা। যেন দীর্ঘকালের গভীর পরিচয়। অথচ কোথায়, কী সূত্রে, তার কিছুই মনে নেই।

লী বলল, আপনাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

হচ্ছে নাকি?

আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন? সিনেমার লোকদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে খুব চেনা চেনা মনে হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনি কখনো সিনেমার অভিনেতাদের রাস্তায় দেখেন নি?

না।

আমি দেখেছি। হাপারকে দুদিন দেখেছি।

তুমি কি নিজেও সিনেমা কর?

না। কেন বলুন তো?

খুব সুন্দর চেহারা তোমার, সেই জন্যেই বলছি।

যান! বেশ লোক তো আপনি 1

কী নাম তোমার?

লী।

শুধু লী?

হ্যাঁ, শুধু লী।

লী চুলের ক্লিপ খুলে চুল আঁচড়াতে লাগল। বুড়ো ভদ্রলোক হাসতে হাসতে পা নাচাতে লাগলেন। লী বলল, এই সম্পূর্ণ কামরা আপনি রিজার্ভ করেছেন?

হ্যাঁ।

আপনি খুব বড়লোক বুঝি?

হ্যাঁ।

সত্যি বলছি, আমারও খুব বড়লোক হতে ইচ্ছে করে!

কী কর তুমি?

প্রাচীন বই বিভাগে কাজ করি। জানেন, আমি অনেক প্রাচীন বই পড়ে ফেলেছি।

বেশ তো।

জানেন, হিতার বলে একটা বই পড়ে আমি কত যে কেঁদেছি।

তুমি দেখি ভারী ছেলেমানুষ, বই পড়ে বুঝি কেউ কাঁদে?

আপনি বুঝি বই পড়েন না?

পড়ি, তবে কাঁদি না। তাছাড়া বাজে বই পড়ার সময় কোথায় বল?

লী বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার মনে হল বুড়ো ভদ্রলোকটি তাকে খুব ভালো করেই চেনেন। কথা বলছেন এমনভাবে, যেন কতদিনের চেনা। অথচ কথার ভিতর কোনো মিল নেই। লী বলল, পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এতে আপনার খারাপ লাগে না?

না।

কেন?

ধবংস তো একদিন হিন্তই।

কিন্তু আপনি যে মরে যাবেন।

আর পৃথিবী ধ্বংস না হলেই বুঝি আমি অমর হয়ে থাকব?

লী চুপ করে থাকল। হুঁ হুঁ করে ছুটে চলেছে গাড়ি। ভদ্রলোক শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন পড়ছেন, কোনো দিকে হুঁশ নেই। কী এমন বই এত আগ্রহ করে পড়া হচ্ছে, দেখতে গিয়ে লী হতবাক। শিশুদের একটা ছড়ার বই। আরোল-তাবোল ছড়া। লী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ছড়ার বই পড়তে আপনার ভালো লাগছে?

খুব ভালো লাগছে। পড়লে তোমারও ভালো লাগবে, এই দেখ না। কী লিখেছে–

করা ভাই হল্লা
নেই কোনো বল্লা
চারিদিকে ফল্লা

লী বিস্মিত হয়ে বলল, বল্লাই বা কী আর ফল্লাই বা কী? আরোল-তাবোল লিখলেই হল?

ভদ্রলোক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, না, কোনো অর্থ অবশ্যি নেই, তবে শুধু মাত্র ধ্বনি থেকেই তো একটা অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।

কী রকম?

ছড়াটা শুনেই কি তোমার মনে হয় নি যে, কোনো অসুবিধে নেই, হল্লা করে বেড়াও। তাই না?

লী মাথা নাড়ল। সে ভাবছিল, লোকটা কে হতে পারে, এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? তাকানির ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, সমস্ত যেন কত চেনা, অথচ কিছুতেই মনে আসছে না।

নিঃশব্দে ট্রেন চলছে। সন্ধা হয়ে আসায় হলুদ বিষন্ন আলো এসে পড়েছে ভেতরে। এ সময়টাতে সবকিছুই অপরিচিত মনে হয়। জানালা দিয়ে তাকালেই দ্রুত সরে সরে যাওয়া গাছগুলি কেও মনে হয় অচেনা। সঙ্গী ভদ্রলোক কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। লী কিছু করার না পেয়ে ধুসর রঙের টেলিভিশন সেটটি চালু করে দিল। সেই একঘেয়ে পুরনো অনুষ্ঠান। ঘন ন জরুরী নির্দেশাবলী, গুজব ছড়াবেন না। বিজ্ঞানীরা আপনাদের সঙ্গেই আছেন। মহাসংকট আসন্ন, সেখানে ধৈর্য হারান মানেই পরাজয়।

এই জাতীয় খবর শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় লীর। ভূতুড়ে টাইফা গ্রহ সবকিছু কেমন পাল্টে দিল। লীর কতই বা বয়স, কিছুই দেখা হয় নি। মঙ্গল গ্রহে নয়, বুধে নয়, এমন কি চাঁদে পর্যন্ত যাস নি। এমনি করেই সব শেষ হয়ে যাবে? লীর চোখ ছলছল করতে থাকে। একবার যদি দেখা করা যেত মাথুর কিংবা ফিহার সাথে। নিদেনপক্ষে সিরান-পল্লীর যে কোনো এক জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না। তাঁরা অসম্ভব ব্যস্ত! চেষ্টা তো লী কম করে নি।

কী হয়েছে লী?

লী চমকে বলল, কই, কিছু হয় নি তো।

কাঁদছিলে কেন?

কাঁদছি, না তো।

পৃথিবীর জন্যে কষ্ট হয়?

পৃথিবীর জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই কষ্ট হয়।

আচ্ছা আমি তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি, একটা হাসির গল্প বলছি।

বলুন।

ভদ্রলোক বলে চললেন, জীববিদ্যার এক অধ্যাপক প্রতিদিন দুপুরে বড়সড় একটা মটন চাপ খেয়ে ক্লাস নিতে যান। একদিম। তিনি ক্লাসে এসে বললেন, আজ তোমাদের ব্যাঙের হৃৎপিন্ড পড়াব। এই দেখি একটি ব্যাঙ। ছেলেরা সমস্বরে বলল, ব্যাঙ কোথায় স্যার, এটি তো একটি চপ। অধ্যাপক বিব্রত হয়ে বললেন, সে কী! আমি তাহলে কী দিয়ে লাঞ্চ সেরেছি?

লী ম্লান হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন, তুমি হাসলে না যে? ভালো লাগে নি?

লেগেছে। কিন্তু টেলিভিশন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় একবার মাথুর কিংবা ফিহার সঙ্গে দেখা করি।

তাদের সঙ্গে দেখা করে তুমি কী করবে?

আমার কাছে একটি অদ্ভুত জিনিস আছে। একটি খুব প্রাচীন বই। পাঁচ হাজার বছর আগের লেখা, মাইক্রোফিল্ম করা। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেয়েছি।

কী আছে সেখানে?

না পড়লে বুঝতে পারবেন না। সেখানে ফিহার নাম আছে, সিরান-পল্লীর কথা আছে, এমন কি পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে কথাও আছে।

বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, আরে, থাম থাম। পাঁচ হাজার বছর আগের বই, অথচ ফিহার নাম আছে!

লী উত্তেজিত হয়ে বলল, সমস্ত না শুনলে আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না।

আমি এর গুরুত্ব বুঝতে চাই না! আমি উদ্ভট কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

লী রেগে গিয়ে বলল, আপনি উদ্ভট কোনো কিছুতে বিশ্বাস করেন না, কারণ আপনি নিজেই একটা উদ্ভট জিনিস।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ফেললেন। লী বলল, আমি যদি মাথুর কিংবা ফিহা কিংবা সিরান-পল্লীর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তবে দেখতেন কেমন হৈচৈ পড়ে যেত।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি কোথায় নামবে?

স্টেশন ৫০০৭-এ।

তৈরি হও। সামনেই ৫০০৭। বেশ আনন্দে কাটল তোমাকে পেয়ে। তবে তুমি ভীষণ কল্পনাবিলাসী, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

কল্পনাবিলাসীরা তো অল্পতেই রাগে, জানেন না?

ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল টেন। ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক একটা ওভারকোটের পকেট থেকে নীল রঙের ত্রিভুজাকৃতির একটা কার্ড বের করে লীকে বললেন, তুমি ভীষণ রেগে গেছ মেয়ে, নাও তোমাকে খুশি করে দিচ্ছি। এইটি নিয়ে সিরান-পল্লীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে। খুশি হলে তো? রাগ নেই তো আর?

লী দেখল। নীল কার্ডে জ্বলজ্বল করছে তিনটি লাল তারা। নিচে ছোট্ট একটি নাম-ফিহা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে? ইনিই মহামান্য ফিহা! এই জন্যেই এত পরিচিত মনে হচ্ছিল?

লীর চোখ আবেগে ঝাপসা হয়ে এল!

ফিহা বললেন, নেমে যাও মেয়ে, নেমে যাও, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

৩. আমি স্রুরা

কে?

আমি স্রুরা ভেতরে আসতে পারি?

এস।

ঘরে হালকা নীল রঙের বাতি জ্বলছিল। মাথুর টেবিলে ঝুঁকে কী যেন পড়ছিলেন, স্রুরার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

এত রাতে আপনার ঘরে আসার নিয়ম নেই, কিন্তু—

স্রুরা চেয়ার টেনে বসলে না। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ধত চোখ জ্বলতে লাগল। মাথুর বললেন, এখন কোনো নিয়ম-টিয়ম নেই স্রুরা। তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি এখন কিছু শুনতে চাই না। চার রাত ধরে আমার ঘুম নেই। আমি ঘুমুতে চাই। এই দেখ আমি একটা প্রেমের গল্প পড়ছি। মন হালকা হয়ে সুনিদ্রা হতে পারে, এই আশায়।

স্রুরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন। আমিও ঘুমাতে শারি না, তার জন্যে আমি রাত জেগে জেগে প্রেমের গল্প পড়ি না। অবসর সময়টাও আমি ভাবতে চেষ্টা করি।

সিডিরির রিপোর্ট তো দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি। ধ্বংস রোধ করার কোনো পথ নেই।

যখন নেই, তখন রাতে একটু শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করা কি উচিত নয়? চিন্তা এবং পরিকল্পনার জন্যে তো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে।

থাকুক পড়ে। আমি একটা সমাধান বের করেছি।

মাথুর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, তুমি বলতে চাও পৃথিবী রক্ষা পাবে?

না।

তবে? স্রুরা কথা না বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাথুরের দিকে। ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনার এ সময় উত্তেজনা মানায় না। আপনি অবসর গ্রহণ করুন।

তুমি কী বলতে চাও, বল।

আমি একটি সমাধান বের করেছি। পৃথিবী রক্ষা পাবার পথ নেই, কিন্তু মানুষ বেচে থাকবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পর আবার সভ্যতার জন্ম হবে। ফিহার মতো, মাথুরের মতো, স্রুরার মতো মহাবিজ্ঞানীরা জন্মাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

স্রুরা তুমি নিজেও উত্তেজিত।

দুঃখিত। আপনি কি পরিকল্পনাটি শুনবেন?

এখন নয়, দিনে বলো।

আপনাকে এখনি শুনতে হবে, সময় নেই হাতে।

স্রুরা ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিলেন। মাথুর তাকিয়ে রইলেন স্রুরার দিকে। দুর্লভ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই যুবকটিকে হিংসা হতে লাগল তাঁর। স্রুরা খুব শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলেন–শুনতে শুনতে মাথুর এক সময় নিজের রক্তে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন।

বছর ত্রিশেক আগে মীটস নামে একটা মহাশূন্যযান তৈরি করা হয়েছিল! আদর করে তাকে ডাকা হত। দ্বিতীয় চন্দ্র বলে। আকারে চন্দ্রের মতো এত বিরাট না হলেও সেটিকে ছোটোখাটো চন্দ্র অনায়াসে বলা যেত। মহাজাগতিক রশ্মিল্পী থেকে সংগৃহীত শক্তিতে একটি কল্পনাতীত বেগে চলবার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ছিল এরই মধ্যে। একটি ছিল মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। বিজ্ঞানী মীটসের তত্ত্বাবধানে এই অসাধারণ যন্ত্রযান তৈরি হয়েছিল–নামকরণও হয়েছিল তাঁর নাম অনুযায়ী। এটি তৈরি হয়েছিল তাঁরই একটি তত্ত্বের পরীক্ষার জন্যে।

মীটস দেখলেন নক্ষত্রপুঞ্জ NGC 1303 আলোকের চেয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে। আলোর কাছাকাছি গতিসম্পন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক আগে, এই প্রথম তিনি বিজ্ঞানের সূত্রে সম্ভব নয় এমন একটি ব্যাপার পরখ করলেন। তিনি অসাধারণ মেধার

অধিকারী ছিলেন এবং খুব অল্প সময়ে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, আলোর গতি ধ্রুব নয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন।–স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির নিয়মাবলীও ভিন্ন ভিন্ন পরিমন্ডলে ভিন্ন। মীটস এটা ব্যাখ্যা করেই চুপ করে গেলেন। তৈরি করলেন মহাশূন্যযান–মীটস, যা পাড়ি দেবে এড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ছাড়িয়েও বহুদূরে NBP203 নক্ষত্রপুঞ্জে। সেখানে পৌঁছুতে তার যুগের পর যুগ লেগে যাবে, কিন্তু পৌঁছুবে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে মীটসের ধারণা সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য মহাশূন্যযানটি প্রস্তুত হবার পরপর তিনি মারা যান। তাঁর পরিকল্পনাও স্থগিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রতি-বস্তুর ধর্মকে বিশেষ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

স্রুরার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, পৃথিবীর একদল শিশু মীটসে করে সরিয়ে দেওয়া। শিশুরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মহাশূন্যযানের ভিতর শিক্ষা লাভ করবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হবে মহাশূন্যযানের এক লাইব্রেরি কক্ষে। এই সব শিশু বড় হবে। তাদের ছেলেমেয়ে হবে, তারাও শিখতে থাকবে, তারাও বড় হবে–

থাম থাম বুঝতে পারছি। মাথুর হাত উঁচিয়ে স্রুরাকে থামালেন। বললেন, কতদিন তারা এ রকম ঘুরে বেড়াবে?

যতদিন বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ না পায়। যতদিন মহাশূন্য থাকবে, ততদিন তো খাদ্যের কোনো অসুবিধা নেই!

তা নেই–তা নেই। কিন্তু—

আবার কিন্তু কিসের? মহাশূন্যধান তৈরি আছে, কাজ যা করতে হবে তা হল ল্যাবরেটরি দুটি সরিয়ে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসান, তার জন্যে তিন মাস সময় যথেষ্ট। এ দায়িত্ব আমার!

মাথুর চুপ করে রইলেন। স্রুরা অসহিষ্ণু হয়ে মাথা ঝাকালেন, আপনার চুপ করে থাকা অর্থহীন। মানুষের জ্ঞান এভাবে নষ্ট হতে দেয়া যায় না।

তা ঠিক। কিন্তু সিরানদের মতামত–

কোনো মতামতের প্রয়োজন নেই। এ আমাকে করতেই হবে, আমি কম্পিউটার সিডিসিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি মহাশূন্যযানটির যাত্রাপথ বের করতে। সিডিসিকে মহাশূন্যযানে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। মহাশূন্যযান নিয়ন্ত্রণ করবে। সে।

তুমি নির্দেশ দিয়ে এসেছ?

হ্যাঁ, আমি সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙে এ করেছি। আমি আপনাকেও মানি না–আপনার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। গত একমাস আপনি প্রত্যেক মীটিং-এ আরোল-তাবোল বিকেছেন। আপনি বিশ্রাম নিন।

স্রুরা উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথুর হতভম্ব হয়ে বের হয়ে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে কে যেন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখলে পাথবের মুর্তি মনে হয়। মাথুর ডাকলেন, কে ওখানে?

আমি ওলেয়া।

ওখানে কী করছেন?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখছি। আমার একটি ছেলে চাঁদে এ্যাকসিডেন্ট করে মারা গিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে।

আছে। কিন্তু এত দূরে এসে চাঁদ দেখছেন? আপনার ঘর থেকেই তো দেখা যায়।

তা যায়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে দেখি স্রুরা গল্প করছেন। আপনার সঙ্গে, তাই বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।

বলুন কী বলবেন।

আমাকে ছুটি দিন আপনি। বিজ্ঞানীরা তো কিছুই করতে পারছেন না। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে কী হবে? মরবার আগে আমি আমার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে থাকতে চাই।

তা হয় না ওলেয়া।

কেন হয় না?

আপনি চলে গেলে অন্য সবাই চলে যেতে চাইবে। সিরান-পল্লীতে কেউ থাকবে না।

নাই-বা থাকল, থেকে কী লাভ?

শেষ মুহূর্তে আমরা একটা বুদ্ধি তো পেয়েও যেতে পারি।

আপনি বড় আশাবাদী মাথুর।

হয়তো আমি আশাবাদী। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, পৃথিবী আরো একবার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সৌর বিস্ফোরণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ দু, শ বছর আগের বিজ্ঞানীরাই সে সমস্যার সমাধান করেছেন। আমরা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি জানি, আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।

ওলেয়া অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না। এই মহাসংকট তুচ্ছ করে ফিহা বেড়াতে চলে গেলেন। আপনি নিজে এখন পর্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। স্রুরার যত প্রতিভাই থাকুক, সে তো শিশুমাত্র, এ অবস্থা–?

কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, স্রুরা উত্তেজিতভাবে হেটে আসছেন। হাত দুলিয়ে হাঁটার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে একটা কিছু হয়েছে।

মহামান্য মাথুর।

বল।

এইমাত্র একটি মেয়ে এসে পৌঁচেছে। তার হাতে মহামান্য ফিহার নিজস্ব পরিচয়-পত্র রয়েছে।

সে কী!

মেয়েটি বলল, সে একটি বিশেষ কাজে এসেছে, কী কাজ তা আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবে না।

কিন্তু ফিহার পরিচয়-পত্র সে পেল কোথায়?

ফিহা নিজেই নাকি তাকে দিয়েছেন।

আশ্চর্য!

লী নিজেও বেশ হকচাকিয়ে গিয়েছিল। সিরান এলাকায় এমন অবাধে ঘুরে বেড়াবে তা কখনো কল্পনা করে নি। ফিহার ত্রিভুজাকৃতি কার্ডটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে। অনেকেই যে বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাও সে লক্ষ করল। বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বিনীতভাবে লীর নামও জানতে চাইলেন।

মাথুর বললেন, শুনেছি আপনি ফিহার কাছ থেকে আসছেন?

জ্বি।

আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর এনেছেন?

জ্বি না।

তবে?

আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, আপনি সে বইটি আশা করি পড়বেন!

কী নিয়ে এসেছেন?

একটি বই।

লী তার ব্যাগ থেকে বইটি বের করল।

কী বই এটি?

পড়লেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।

মাথুর হাত বাড়িয়ে বইটি নিলেন। বিস্ময়ে তাঁর ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। লী বলল, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি?

৪. ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন

ফিহা গাড়ি থেকে নামলেন সন্ধ্যাবেলা। স্টেশনে আলো জ্বলছিল না। চারদিক কেমন চুপচাপ থমথম করছে। যাত্রী বেশি নেই, যে কয়জন আছে তারা নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। বছর পাঁচে<ৎ আগেও একবার এসেছিলেন ফিহা। তখন কেমন গমগম করত চারদিক। টুরিস্টের দল হৈ হৈ করে নামত। অকারণ ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি–চমৎকার লাগত। এখন সব বদলে গেছে। ফিহার কিছুটা নিঃসঙ্গ মনে হল।

আমার আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। ফিহা তাকিয়ে দেখলেন, নিকি পৌঁচেছে। নিকিকে তার করা হয়েছিল স্টেশনে থাকার জন্যে। ফিহা বললেন, এমন অন্ধকার যে?

কদিন ধরেই তো অন্ধকার।

কেন?

পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। সমস্তই বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন। জানেন না?

না।

একটা উপগ্রহ ছাড়া হচ্ছে। এখানকার পৃথিবীর কিছু শিশুকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। স্রুরার পরিকল্পনা।

অ।

দু জনে নীরবে হাঁটতে লাগলেন। ফিহা বললেন, সমস্ত বদলে গেছে।

হ্যাঁ। সবাই হতাশ হয়ে গেছে। উৎপাদন বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। খুব বাজে ব্যাপার।

হুঁ।

আপনি হঠাৎ করে এ সময়ে?

আমি কিছু ভাবতে এসেছি। নিরিবিলি জায়গা দরকার।

টাইফা গ্রহ নিয়ে?

হুঁ।

আপনার কী মনে হয়? কিছু করা যাবে?

জানি না, হয়তো যাবে না, হয়তো যাবে। ঘর ঠিক করেছ। আমার জন্যে?

জ্বি।

আমার একটা কম্পিউটার প্রয়োজন।

কম্পিউটার চালাবার মতো ইলেকটিসিটি কোথায় পাবেন?

ছোটখাটো হলেও চলবে। কিছু হিসাব-টিসাব করব। আছে সে রকম?

তা আছে।

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দু কামরার ঘর একটা। ফিহার পছন্দ হল খুব। নিকি বড় দেখে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফিহা বসে বসে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। এ কয়দিন তাঁর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীতে। সবচে আগে তাঁর চোখে পড়ল শীতলকক্ষের খবরটি। শীতলকক্ষ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীতলকক্ষের সমস্ত ঘুমন্ত মানুষদের জাগান হয়েছে, তারা ফিরে গেছে আত্মীয়স্বজনদের কাছে। কী আশ্চর্য!

পৃথিবীতে শীতলকক্ষ স্থাপনের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নেতেনটি। ভারি চমৎকার একটি ব্যবস্থা। নব্বুই বছর বয়স হওয়ামাত্র যেতে হবে শীতলকক্ষে। সেখানে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে আরো এক শ বছর। এর ভেতর তারা মাত্র পাঁচবার কিছুদিনের জন্যে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। তারপর আবার ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতেই নিঃশব্দ মৃত্যু। নেতেনটির এই সিদ্ধান্তের খুব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রথম দিকে, পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন এত উন্নত যে একটি মানুষ অনায়াসে দেড় শ বছর বাঁচতে পারে। অথচ নাবুই বছরের পর তার পৃথিবীকে দেবার মতো কিছুই থাকে না। বেঁচে থাকা সেই কারণেই অর্থহীন। কাজেই শীতলকক্ষের শীতলতায় নিশ্চিন্ত ঘুম। মানুষটি বেঁচে থাকলে তার পিছনে যে খরচটি হত তার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র খরচ এখানে। হার্টের বিট সেখানে ঘণ্টায়

দুটিতে নেমে আসে, দেহের তাপ নামে শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। সেখানে শরীরের প্রোটোপ্লাজমকে বাঁচিয়ে রাখতে খুব কম শক্তির প্রয়োজন।

শীতলকক্ষের সব মানুষ জেগে উঠে তাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গেছে–এ খবর ফিহাকে খুব আলোড়িত করল। দু-তিন বার পড়লেন খবরটি। নিজের মনেই বললেন, সত্যিই কি মহাবিপদ? সমস্ত-নিয়ম কানুন ভেঙে পড়ছে এভাবে। না—তা কেন হবে–

যারা কোনো দিন পৃথিবীকে চোখেও দেখল না, তাদের কথা কি কখনও ভেবেছেন ফিহি?

নিকি চা নিয়ে কখন যে ফিহার সামনে এসে বসেছে এবং চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, ফিহা তা লক্ষই করেন নি।

কাদের কথা বলছ নিকি?

মানুষদের কথা, যাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে মহাকাশযানে কিংবা অন্য উপগ্রহে। জানেন ফিহা, পৃথিবীতে ফিরে এসে একবার শুধু পৃথিবীকে দেখবে, এই আশায় তারা পাগলের মতো।–

নিকি, তুমি জান আমি কবি নই। এসব বাজে সেন্টিমেন্ট আমার ভালো লাগে art!

আমি দুঃখিত। চায়ে চিনি হয়েছে?

হয়েছে।

আপনার আর কিছু লাগবে, কোনো সহকারী?

না, তার প্রয়োজন নেই। তুমি একটা কাজ করবে নিকি?

বলুন কি কাজ।

আমার বাবা-মা শীতলকক্ষ থেকে বেরিয়ে হয়তো আমাকে খুজছেন।

তাদের এখানে নিয়ে আসব?

না না। তাঁরা যেন আমার খোঁজ না পান। আমি একটা জটিল হিসাব করব। খুব জটিল!

ঠিক আছে।

রাতে বাতি নিভিয়ে ফিহা সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। মাথার কাছে মোমবাতি রেখে দিলেন। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আলো জ্বালিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, এই জন্যে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে, এমন সময় একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল। ফিহার মনে হল ঘরের ভিতর কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে আবছা মতো একটা মূর্তি দেখতে পেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, কে?

আমি।

আমিটি কে?

বলছি। দয়া করে বাতি জ্বালাবেন না।

ফিহা নিঃশব্দে বাতি জ্বালালেন। আশ্চর্য। ঘরে কেউ নেই। তিনি বাতি হাতে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

কাল সকালে ডাক্তারের কাছে যাব। আমি অসুস্থ, আরোল-তাবোল দেখছি। জটিল একটা অঙ্ক করতে হবে। আমাকে। এ সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। ফিহা মনে মনে বললেন।

বাকি রাতটা তাঁর বারান্দায় পায়চারি করে কাটল।

মাথুর ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। সমস্ত বইটা পড়তে আমার এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। মনে মনে এই ভাবলেন। আসন্ন বিপদের হয়তো তাতে কোনো সুরাহা হবে না, তবু তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। সে তুলনায় এ তো অনেক বড় অবলম্বন। স্বয়ং ফিহা বলে পাঠিয়েছেন যেখানে।

রাত জেগে জেগে মাথুরের মাথা ধরেছিল। চোখ কার্যকর করছিল। তবু তিনি পড়তে শুরু করলেন। বাইরে অনেক রাত। বারান্দায় খ্যাপার মতো হাঁটছেন স্ত্ররা। খটখট শব্দ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে মাথুর পড়ে চললেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তা কী করে হয়? না না অসম্ভব।

–আমি নিশ্চিত বলতে পারি যিনি এই বই পড়ছেন, রূপকথার গল্প ভেবেই পড়ছেন। অথচ এখানে যা যা লিখেছি একদিন আমি নিজেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। মাঝে মাঝে আমারো সমস্ত ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয়, হয়তো আমার মাথার দোষ হয়েছিল, বিকারের ঘোরে কত কী দেখেছি। কিন্তু আমি জানি মস্তিষ্ক বিকৃতিকালীন স্মৃতি পরবর্তী সময়ে এত স্পষ্ট মনে পড়ে না। তখনি সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্য বলে মনে হয়। বড় রকমের হতাশা জাগে। ইচ্ছে করে মরে যাই! ঘুমুতে পারি না, খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এই জাতীয় অস্থিরতা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি লিখতে শুরু করলাম এই আশায়, যে, কেউ একদিন আমার লেখা পড়ে সমস্তই ব্যাখ্যা করতে পারবে। অনেক সময়ই তো দেখা গেছে আজ যা রহস্য, কাল তা সহজ স্বাভাবিক সত্য। আজ যা বুদ্ধির অগম্য, কাল তা-ই সহজ সীমান্য ঘটনা।

আমার সে রাতে ঘুম আসছিল না। বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছি। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মার কাছে বেড়াতে গেছে। বিশেষ কাজ ছিল বলে আমি যেতে পারি নি। ফাঁকা বাড়ি বলেই হয়তো আমার বিষন্ন লাগছিল। সকাল সকাল শুয়েও পড়েছিলাম। ঘুম এল না–মাথা দপদপ করতে লাগল। এক সময় দুর ছাই বলে বাগানে চেয়ার টেনে বসলাম। এপ্রিল মাসের রাত। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, খুব সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। এত পরিষ্কার আলো যে মনে হতে লাগল অনায়াসে এই আলোতে বই পড়া যাবে। মাঝে মাঝে মানুষের ভিতরে যে রকম ছেলেমানুষি জেগে ওঠে, আমারো তেমনি জেগে। উঠল। খুব ইচ্ছা হতে লাগল একটা বই এনে দেখেই ফেলি না পড়া যায়। কিনা। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নির্জনতায় কেমন ভয়ভয় লাগে, আবার ভালোও লাগে। চুপচাপ বসে আরোল-তাবোল কত কি ভাবছি, এমন সময় একটা হালকা গন্ধ নাকে এল, মিষ্টি গন্ধ। কিছু ভালো লাগে না, অস্বস্তি বোধ হয়। কিসের গন্ধ এটি? বের করতে চেষ্টা

করতে লাগলাম এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, গন্ধের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। হাত-পা অসাড় হয়ে উঠতে লাগল। যতই ভাবছি। এইবার উঠে দৌড়ে পালাব, ততই সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। ভীষণ ভয় হল আমার। সেই সময় ঘুম পেতে লাগল। কিছুতেই ঘুমাব না, নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত গ্যাসের খপ্পরে পড়েছি, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাড়া ছাড়া কাটা কাটা ঘুম। চোখ মেলতে পারছিলাম না, তবে মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসছিল তখনও।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। ঘুম ভাঙাল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ। চোখ মেলে। আমি দিন কি রাত বুঝতে পারলাম না। কোথায় আছি, আশেপাশে কাদের ফিসফিস শব্দ শুনছি কে জানে? চোখের সামনে চোখ-ধাঁধানো হলুদ আলো। বমি করার আগের মুহূর্তে যে ধরনের অস্বস্তি বোধ হয়, সে ধরনের অস্বস্তি বোধ নিয়ে আমি জেগে রইলাম!

বুঝতে পারছি সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি একটি অদ্ভূত অবস্থায় আছি। অচেতন নই, আবার ঠিক যে চেতনা আছে তাও নয়। কিছু ভাবতে পারছি না। আবার শারীরিক যাতনাগুলিও সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। আমার মনে হল দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র হলুদ আলো নিয়ে আমি যেন অনন্তকাল ধরে জেগে আছি। মাঝে মাঝে একটা বিজবিজ শব্দ কানে আসে।–লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এক সঙ্গে উড়ে গেলে যে রকম শব্দ হত, অনেকটা সেই রকম।

আমি কি মারা গেছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? এই জাতীয় চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হয়তো আরো কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যেতম। কিন্তু তার আগেই কে যেন মিষ্টি করে বলল, একটু ধৈর্য ধরুন, খুব অল্প সময়।

স্পষ্ট গলার স্বর, নিখুত উচ্চারণ। আমার শুনতে একটুও অসুবিধে হল না। সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে চেঁচিয়ে উঠলাম, আপনি কে? আমার কী হয়েছে?

গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না। কিন্তু তবুও শুনলাম। কেউ যেন আমাকে সান্তনা দিচ্ছে, সেই আগের মিষ্টি নরম গলা।

একটু কষ্ট করুন। অল্প সময়। খুব অল্প সময়। বলুন আমার সঙ্গে, এক—

এক।

বলুন, দুই।

আমি বললাম। সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকল। হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ ছাড়িয়ে বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আওড়াতে থাকলাম। আমার চোখের উপর উজ্জ্বল হলুদ আলো, বুকের ভেতর হা হা করা তৃষ্ণা। অর্ধচেতন অবস্থায় একটি অচেনা অদেখা ভৌতিক কণ্ঠের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটির পর একটি সংখ্যা বলে চলছি। যেন কত যুগ কত কাল কেটে গেল। আমি বলেই চলেছি—বলেই চলেছি।

এক সময় মাথার ভিতর সব জট পাকিয়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলার মতো অতি সামান্যতম বাতাসও যেন আর নেই। বুক ফেটে গুড়িয়ে ধাচ্ছে। আমি প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করলাম, আর নয়, আমাকে মুক্তি দিন। আমি মরে যেতে চাই–আমি মরে যেতে চাই।

আবার সেই গলা, এইবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল। আহা কী শান্তি! কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি। দ্রুত। হলুদ আলো ফিকে হয়ে আসছে। শারীরিক যন্ত্রণাগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে।–শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কী শান্তি!

জানি না কখন ঘুম ভাঙল। খুব স্বাভাবিকভাবে চোখ মেললাম। একটা ধাতব চেয়ারে বসে আছি। চেয়ারটি গোলাকার একটি ঘরের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। ঠিক আমার মাথার কাছে ছোট্ট একটি নল দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ঘরের বাতাস যেন একটু ভারি। বাতাসের সঙ্গে লেবু ফুলের গন্ধ মিশে আছে। আমি ভালো করে চারদিক দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল ঘরটিতে কোনো দরজা-জানালা নেই। চারদিক নিশ্ছিদ্র। ঘরে কোনো বাতি নেই। তবু সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে নীলাভ আলো আসছে হয়তো।

আমার তখন প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। কোথায় আছি, আমার কী হয়েছে–এ সমস্ত ছাড়িয়ে শুধুমাত্র একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটি হল ক্ষুধা। আমার ধারণা ছিল, হয়তো আগের মতো কথা বলতে পারব না, তবু বললাম, আমি কোথায় আছি?

সে শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। গোলাকার ঘরের জন্যই হয়তো সে শব্দ চমৎকার প্রতিধ্বনিত হল। এবং আশ্চর্য, সে শব্দ বাড়তেই থাকল।–

আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি–?

এক সময় যেন মনে হল লক্ষ লক্ষ মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করছে। আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। দশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুণলাম, আমি কি অচেতন অবস্থায় এসব শুনছি, না। সত্যি কিছু জ্ঞান এখনো অবশিষ্ট আছে, তা জানার জন্যে।

এখন লিখতে খুব অবাক লাগছে, সেই অবস্থাতেও কী করে আমি এতটা স্বাভাবিক ছিলাম! অবশ্যি সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল সম্ভবত আমার মাথায় চোট লেগে মস্তিকের কোনো এক অংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। অবাস্তব দৃশ্যাবলী দেখছি। এক সময় প্রচন্ড খিদে সত্ত্বেও আমার ঘুম পেল। ঘুমিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তেও শুনতে পেলাম সমুদ্রগর্জনের মতো কোলাহল।

আমি কোথায় আছি? আমি কোথায় আছি–?

কতক্ষণ এভাবে কাটিয়েছিলাম মনে নেই। এক সময় সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, আলস্য নেই। যেন ছুটির দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি। চোখ মেলতে ভয় লাগছিল, কে জানে আবার হয়তো সেই সব আজগুবি ব্যাপার দেখতে থাকব। কান পেতে আছি। যদি কিছু শোনা যায়। না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক সুনসান।

তোমার চা।

চমকে তাকিয়ে দেখি আনা, আমার স্ত্রী, দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে। আমি শুয়ে আছি। আমার অতি পরিচিত বিছানায়। টেবিলের উপর আগের মতো আগোছাল বইপত্র পড়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! আমি প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম,

আনা আমার কী হয়েছে?

আনা চায়ের পেয়ালা হাতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই মনে হল, এই মেয়েটি অন্য কেউ, এ আনা নয়। যদিও সেই চোখ, সেই ঢেউ খেলান বাদামী চুল, গালের মাঝামাঝি লাল রঙের কাটা দাগ। আমি ভয়ে কাতর গলায় বললাম, তুমি কে? তুমি কে?

আমি আনা।

না তুমি আনা নিও।

আমি কি দেখতে আনার মতো নাই?

দেখতে আনার মতো হলেও তুমি আনা নাও!

বেশ নাই-বা হলাম, চা নাও।

আমি আবার বললাম, দয়া করে বল তুমি কে?

বলছি। সমস্তই ধীরে ধীরে জানবে।

আমি কোথায় আছি?

তুমি তোমার পৃথিবী থেকে বহু দূরে। ভয় পেয়ো না, আবার ফিরে যাবে। তোমাকে আনা হয়েছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে।

কারা আমাকে এখানে এনেছে?

এখানে যাদের বাস, তারা এনেছে। যারা আমাকে তৈরি করেছে তারা। চতুর্মাত্রিক জীবেরা।

তোমাকে তৈরি করা হয়েছে?

হ্যাঁ, আমাকে তৈরি করা হয়েছে তোমার সুখ ও সুবিধার জন্যে। তাছাড়া আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব। আমার মাধ্যমেই তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে।

কাদের সঙ্গে কথা বলব?

যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে।

যারা আমাকে নিয়ে এসেছে তারা কেমন? তারা কি মানুষের মতো?

তাদের তুমি দেখতে পাবে না। এরা চতুর্মাত্রিক জীব। পৃথিবীর মানুষ ত্রিমাত্রিক জিনিসই শুধু দেখতে পায় ও অনুভব করস্কে পারে। সেগুলি তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চতুমর্হত্রিক জগৎ তোমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না।

শুনতে শুনতে আমার গা ছমছম করতে লাগল। এসব কী বলছে সে! ভয় পেয়ে আমি মেয়েটির হাত ধরলাম। এই অদ্ভুত তৈরি পরিবেশে তাকেই আমার একান্ত আপন জন মনে হল। মেয়েটি বলল, আমাকে তুমি আনা বলেই ভাববে। আপনার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করতে, সেইভাবেই আলাপ করবে। আমাকে ভয় পেয়ো দিন। তোমার যা জানতে ইচ্ছে হবে। আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। আমি তো তোমাকে বলেছি, আবার তুমি ফিরে যাবে তোমার সত্যিকার আনার কাছে।

আমি বললাম, এই যে আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি, নিজের বইপত্র টেবিলে পড়ে আছে, এসবও কি আমার মতো পৃথিবী থেকে আনা হয়েছে?

এইগুলি আনতে হয় নি। তৈরি করা হয়েছে। ইলেকটন, প্রোটন এই সব জিনিস দিয়ে তৈরি হয় এটম। বিভিন্ন এটমের বিভিন্ন অনুপাতে তৈরি হয় এক একটি বস্তু। ঠিক তো?

হ্যাঁ, ঠিক।

কোনো বস্তুর প্রতিটি ইলেকট্রন, প্রোটন কী অবস্থায় আছে এবং এটমগুলি কীভাবে আছে, সেগুলি যদি জানা থাকে এবং ঠিক সেই অনুপাতে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং এটম রাখা যায়। তবেই সেই বস্তুটি তৈরি হবে। ঠিক তো?

হয়তো ঠিক।

কিছু শক্তি খরচ করলেই হল। এইভাবেই তোমার ঘর তৈরি হয়েছে। আমিও তৈরি হয়েছি। এখানকার জীবরা মহাশক্তিধর। এই হচ্ছে তোমার প্রথম পাঠ। হ্যাঁ, এবার চা খাও। দাও, চায়ে চুমুক দাও।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আনা অল্প অল্প হাসছে। আমার সে মুহূর্তে এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি আনা বলেই ভাবতে ইচ্ছে হল।

আমার নিজের অনুভূতি কখনো খুব একটা চড়া সুরে বাধা ছিল না। সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এসেছি। হঠাৎ করেই যেন সব বদলে গেল। নিজেকে যদিও ঘটনাপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলাম, তবু একটা ক্ষীণ আশা সব সময় লালন করেছি।–হয়তো এক সময় দেখব। আশেপাশে যা ঘটছে। সমস্তই মায়া, হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠব। মেয়েটি বলল, কী তাবিছ?

কিছু ভাবছি না। আচ্ছা একটা কথা—

বল।

কী করে এসেছি আমি এখানে?

সেই জটিল প্রক্রিয়া বোঝবার উপায় নেই।

এটা কেমন জায়গা?

কেমন জায়গা তা তোমাকে কী করে বোঝাব? তুমি ত্রিমাত্রিক জগতের লোক, আর এটি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক জগৎ।

কিছুই দেখা যাবে না?

চেষ্টা করে দেখা যাও, বাইরে পা দাও। দরজাটা আগে খোল। কী দেখছ?

আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। চারিদিকে ঘন ঘোলাটে হলুদ আলো। পেটের ভেতরে চিনচিনে ব্যথা। মাথা ঘুরতে লাগল আমার।

থাক আর দেখবার কাজ নেই, এসে পড়া।

আমার মনে হল মেয়েটি যেন হাসছে আপন মনে। আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটি বলল, তুমি অল্প কিছুদিন থাকবে এখানে। তারপর তোমাকে পাঠান হবে একটা ত্রিমাত্রিক জগতে, সেখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি বললাম, তুমি থাকবে তো সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। আমি তোমার এক জন শিক্ষক।

আচ্ছা একটা কথা–

বল।

এখানকার জীবদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কী করে হয়?

আমি জানি না।

তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না?

না।

তাদের সঙ্গে তোমার কথা হয় না?

না।

আমার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হবে তা তাদের কী করে জানাবো?

তাদের জানাতে হবে না। আমি কি নিজের থেকে কিছু বলি তোমাকে? যা বলি সমস্তই ওদের কথা। চুপ করে আছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি, তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

তোমাকে ধন্যবাদ।

দিন-রাত্রির কোনো তফাৎ ছিল না বলেই আমি ঠিক বলতে পারব না, কদিন সেই ছোট্ট ঘরটিতে ছিলাম। ক্ষুধা—তৃষ্ণা আগের মতোই হয়। নিজের বাসায় যে ধরনের খাবার খাওয়া হত, সেই ধরনের খাবারই দেওয়া হয় এখানে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হল সেই মেয়েটি, যে দেখতে অবিকল আনার মতো, অথচ আনা নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, মেয়েটির সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা হল। মাঝে মাঝে আমার প্রচন্ড ভ্রম হত এ হয়তো সত্যি আনা। সে এমন অনেক কিছুই বলতে পারত, যা আনা ছাড়া অন্য কারো বলা সম্ভব নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এসব কী করে জানলে?

মেয়েটি হেসে বলেছে, যে সমস্ত স্মৃতি আনার মেমরি সেলে আছে, সে সমস্ত স্মৃতি আমার ভেতরেও তৈরি করা হয়েছে। আনার অনেক কিছুই মনে নেই, কিন্তু আমার আছে।

আমি এসব কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। এ কেমন করে হয়! একদিন নখ দিয়ে আচড়ে দিলাম মেয়েটির গালে, সত্যি সত্যি রক্ত বেরোয় কিনা দেখতে। সত্যিই রক্ত বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়ে বলল, এসব কী ছেলেমানুষি কর?

দেখি, তুমি সত্যি মানুষ না অন্য কিছু।

এর ভেতর আমি অনেক কিছু শিখলাম। অনেক কিছুই বুঝতে পারি নি। আনার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান এমনিতেই আমি কম বুঝি। চতুর্মাত্রিক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবাত হল।

চতুর্মাত্রিক জীবরা কি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে?

না, করে না।

এরা কেমন? অথাৎ ব্যাপারটি কী?

এরা হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা শক্তির মতো? যেমন মনে কর এক গ্লাস পানি। পানির প্রতিটি অণু একই রকম। কোনো হেরফের নেই। সমস্ত অণু মিলিতভাবে তৈরি করেছে পানি। এরাও সে রকম। কারোর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। সম্মিলিতভাবেই তাদের পরিচয়। তাদের জ্ঞান সম্মিলিত জ্ঞান।

এদের জন্ম-মৃত্যু আছে?

শক্তি তো সব সময় অবিনশ্বর নয়। এরও বিনাশ আছে। তবে আমি ঠিক জানি না কী হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কী রকম হয়?

কী রকম হয় বলতে পারব না, তবে তারা দ্রুত সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একদিন আনা বলল, আজ তোমাকে ত্রিমাত্রিক গ্রহে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমি বললাম, সেখানে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারব তো? আনা হো হো করে হেসে বলল, নিশ্চয়ই। সেটি তোমার নিজের গ্রহ বলতে পোর। তোমার জন্মের প্রায় দু হাজার বৎসর পর পৃথিবীর মানুষের একটা ছোট্ট দল এখানে এসেছিল। তারপর আরো তিন হাজার

বৎসর পার হয়েছে। মানুষেরা চমৎকার বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ভারি সুন্দর জায়গা।

আমার জন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পরের মানুষদের কাছে আমি কী করে যাব?

তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি চতুর্মাত্রিক জগতে আছ। এখানে ত্রিশ হাজার বৎসর আগেও যা, ত্রিশ হাজার বৎসর পরেও তা।

তার মানে আমার বয়স কখনো বাড়বে না?

নিশ্চয়ই বাড়বে। শরীরবৃত্তির নিয়মে তুমি বুড়ো হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন?

তুমি কি একটি সহজ সত্য জান? কী সত্য? তুমি কি জান যে, কোনো যন্ত্রযানের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই যন্ত্রযানে করে ভবিষ্যতে পাড়ি দেয়া যায়?

শুনেছি কিছুটা।

চতুর্মাত্রিক জগৎ একটা প্রচন্ড গতির জগৎ। সে গতি আলোর গতির চার গুণ বেশি। সে গতি হচ্ছে ঘূণায়মান গতি। তুমি নিজে চতুর্মাত্রিক জগতে আছে। কাজেই অবিশ্বাস্য গতিতে ঘুরছ। যে গতি অনায়াসে সময়কে অতিক্রম করে।

কিন্তু আমি যতদূর জানি–কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির কাছাকাছি আসে, তখন তার ভর অসীম হয়ে যায়।

তা হয়।

তাহলে তুমি বলতে চাও আমার ভর এখন অসীম?

না। কারণ তুমি বস্তু নও, তুমি এখন শক্তি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তুমি তৈরি হয়ে থাক। তোমাকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক জগতে যাব এবং তার পরই তোমার কাজ শেষ।

ভিতরে ভিতরে আমি তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কী করে কী হচ্ছে? আমাকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা হবে, এতা জানার জন্যে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এত উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয়ই কোনো একটি অশুভ শক্তির জন্যে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তুলতে গেলে যেমন বুক-কোপান আতঙ্ক নিয়ে বসে থাকতে হয়, বিভিন্ন গ্রহে যাবার জন্যে আমি তেমনি আতঙ্ক নিয়ে প্রতীক্ষ করতে লাগলাম।

যদিও অন্য একটি গ্রহে যাবার কথা ভেবে আতঙ্কে আমার রক্ত জমে যাচ্ছিল, তবু যাত্রাটা কী করে হয়, তা জানার জন্যে প্রচন্ড কৌতূহলও অনুভব করছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এত হঠাৎ করে হল যে, আমি ঠিক কী যে হচ্ছে তাই বুঝতে পারলাম না।

দেখলাম চোখের সামনে থেকে আচমকা পরিচিত ঘরটি অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চোখ-ধাঁধান হলুদ আলো–যার কথা আমি আগেও অনেক বার বলেছি। মাথার ভিতরে তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা। যেন কেউ সূক্ষ্ম তলোয়ার দিয়ে সাঁই করে মাথাটি দু, ফাঁক করে ফেলেছে। ঘুরঘুর করে উঠল পেটের ভিতর পা ও হাতের পাতাগুলি জ্বালা করতে লাগল। আগেই বলেছি সমস্ত ব্যাপারটি খুব অল্প সময়ের ভিতর ঘটে গেল। সমস্ত অনুভূতি উল্টেপাল্টে যাবার আগেই দেখি চৌকোণা একটি ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একা, মেয়েটি পাশে নেই। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তার চারপাশে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। চকচকে ঘড়ির ডায়ালের মতো অজস্র ডায়াল। কোনোটির কাটা স্থির হয়ে আছে। বড় বড়। লিভার জাতীয় কিছু যন্ত্র। গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয়। হাত দিয়ে চাপ দেবার জন্যে তৈরি। টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের মতো বোতামের রাশ। প্রতিটিতেই হালকা আলো জ্বলছে। মাথার ঠিক উপরে সা সাঁ করে পাখা ঘুরছে। পাখাটির আকৃতিও অদ্ভূত। ফুলের কুড়ি ফুটে উঠছে, আবার বুজে যাচ্ছে–এই রকম মনে হয়। কোনো বাতাস আসছে না। সেখান থেকে। পিপি। করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হচ্ছে কেবল। হঠাৎ পরিষ্কার শুনলাম, দয়া করে অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলুন। আলোর বেগে এসেছেন। আপনি এখানে। আপনার শরীরের প্রতিটি অণু থেকে গামা রশ্মি১৭ বিকিরণ হচ্ছে, আমরা এটি বন্ধ করছি। কিছুক্ষণের ভিতরেই আপনি আসবেন আমাদের মধ্যে। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।

আমি চুপ করে কথাগুলি শুনলাম। যেভাবে বলা হল সেভাবেই নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আবার তাদের গলা শোনা গেল, আপনি দয়া করে আমাদের কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিন।

আমি বললাম, প্রশ্ন করুন, আমি জবাব দিচ্ছি।

আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?

না।

আপনার কি মাথা ধরেছে?

কিছুক্ষণ আগে ধরেছিল, এখন নেই।

মুগা বলুন তো ঘরে কী রঙের আলো জ্বলছে?

নীল।

ভালো করে বলুন, সবুজ নয় তো?

না, সবুজ নয়।

হালকা নীল?

না, ঘন নীল। আমাদের পৃথিবীর মেঘশূন্য আকাশের মতো। উত্তর শুনে প্রশ্নকতা একটু যেন হকচাকিয়ে গেলেন। কারণ পরবর্তী কিছুক্ষণ আর কোনো প্রশ্ন 6siন্মা 65ছ না!

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রশ্নকতা এবার থেমে থেমে বললেন, আপনি কি জানেন, আমাদের পূর্বপুরুষ একদিন পৃথিবী থেকেই এ গ্রহে এসেছিলেন?

আমি জানি।

আপনি আমাদের একান্ত আপন জন। আপনি এখানে এসেছেন, সেই উপলক্ষে আজ আমাদের জাতীয় ছুটির দিন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য আপনারা জানতেন আমি এসেছি?

নিশ্চয়ই।

আপনাদের এ গ্রহের নাম?

টাইফা।

আমি লক্ষ করলাম, ঘরের নীল আলো কখন চলে গেছে। সবুজাভ আলোয় ঘর ভরে গেছে। আমি বললাম, শুনুন, আমি এবার সবুজ আলো দেখছি।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে একটি অংশ নিঃশব্দে ফাকি হয়ে যেতে লাগল। আমি দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ অপেক্ষা করছে বাইরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি

সেই গ্রহ থেকে এসেছি, যেখান থেকে তাদের পূর্বপুরুষ একদিন রওয়ানা হয়েছিল। অজানা সেই গ্রহের জন্যে সমস্ত ভালোবাসা এখন হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে।

যাঁরা আমার চার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। একটু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহে কাটিয়ে মানুষের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে শুধু একটু লম্বা, চেহারা একটু সবুজাভা– এই পরিবর্তনটাই চট করে চোখে পড়ে। চোখগুলি অবশ্য খুব উজ্জ্বল। মনে হয়। অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতো আলো ছড়াবে।

আমার নাম ক্রিকি। বলেই তাদের একজন আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। অল্প হেসে বললেন, আপনি আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারছেন তো?

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। লম্বাটে ধরনের মুখ, ঢেউ খেলান লম্বা চুল। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফে একটা জজ্বলে চেহারা। আমি বললাম, খুব ভালো বুঝতে পারছি। আপনারা কি এই ভাষাতেই কথা বলেন?

না, আমরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছি। আমাদের সবার সঙ্গেই অনুবাদক যন্ত্র আছে। আসুন, আমার নিজের ঘরে আসুন।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, বাইরে ঘুরে ঘুরে সব দেখি। এখানকার আকাশ কী রকম? গাছপালাই—বা কেমন দেখতে। প্রথম দিকে আমার যে নিস্পৃহ ভাব ছিল এখন আর সেটি নেই। আমি তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, যা-ই দেখছি তাই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। ক্রিকি বললেন, আমাদের এই গবেষণাগারে চারটি ভাগ আছে। সবচেয়ে

জটিল এবং সবচেয়ে জরুরী বিভাগ হচ্ছে সময় পরিভ্রমণ বিভাগ। জটিলতম কারিগরি বিদ্যা কাজে খাটান হয়েছে। এখান থেকেই সময়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে যাত্রা করান হয়। যেমন আপনি এলেন। তার পরই আছে। অনঅধীত গণিত বিভাগ। দুরকম গণিত আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক, অন্যটি অনঅধীত–অর্থাৎ যে গণিত এখনো কোনো কাজে খাটান যাচ্ছে না। আমাদের এখানকার গণিত বিভাগটি হচ্ছে অনঅধীত গণিত বিভাগ।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগটি কি?

তৃতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থটি প্রতি-পদার্থ১৮ বিভাগ। এ দুটির কাজ হচ্ছে অনঅধীত গণিতকে ব্যবহারিক গণিতে পরিণত করা। আসুন আমি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। আপনি ক্লান্ত নন তো?

না না, আমি ঠিক আছি। আমার সব দেখেশুনে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে! প্রথমে আপনাকে নিয়ে যাব গণিত বিভাগে। অবশ্য সেটি আপনার ভালো লাগবে না।

গণিত বিভাগ দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। হাসপাতালের লম্বা ঘরের মতো মস্তে লম্বা ঘর। রুগীদের যেমন সারি সারি বিছানা থাকে, তেমনি দুধারে বিছানা পাতা। তাদের মধ্যে অদ্ভুত সর বিকৃত শরীর শুয়ে আছে। সবারই বয়স পনের থেকে কুড়ির ভিতরে। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা নড়েচড়ে বসল।

ক্রিকি বললেন, আপনি যে কয়দিন এখানে থাকবেন, সে কয়দিন আপনাকে গণিত বিভাগেই থাকতে হবে। গণিত বিভাগের প্রধান–যিনি এই গবেষণাগারের মহা পরিচালক, তার তাই ইচ্ছে।

আমি ক্রিকির কথায় কান না দিয়ে বললাম, এরা কারা? প্রশ্ন শুনে ক্রিকি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অবশ্যি আমি তখন খুব অবাক হয়ে সারবন্দী পড়ে থাকা এই সব অসুস্থ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছি। কারো হাত-পা শুকিয়ে সুতার মতো হয়ে গিয়েছে, কারো চোখ নেই, কেউ ধনুকের মতো বেঁকে পড়ে আছে। কারো শরীরে আবার দিগদগে ঘা। আমি আবার বললাম, এরা কারা বললেন না?

ক্রিকি থেমে থেমে বললেন, এরা গণিতবিদ। টাইফা গ্রহের গণিতের যে জয়জয়কার, তা এদের জন্যেই। কথা শেষ না হতেই শুয়ে-থাকা অন্ধ একটি ছেলে চেঁচিয়ে বলল, টাইফা গ্রহের উন্নত গণিতের মুখে আমি থুতু দিই। বলেই সে খুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। ক্রিকি বললেন, এই ছেলেটার নাম নিনাষ। মহা প্রতিভাবান।

আমি বললাম, এরা এমন পঙ্গু কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্রিকি বললেন, মায়ের পেটে থাকাকালীন এদের জীনে ১৯ কিছু অদলবদল করা হয়েছে। যার ফলে মস্তিকের একটি বিশেষ অংশের বিশ্লেষণী ক্ষমতা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ওরা ঠিক মানবশিশু হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতীব্র গামা রশ্মির রেডিয়েশনের ফলে যে সমস্ত জ্বীন শরীরের অন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত, তা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ এই বিকলাঙ্গতা। বিজ্ঞান সব সময়ই কিছু পরিমাণে নিষ্ঠুর।

এরা কি জন্ম থেকেই অঙ্কবিদ?

না। বিশিষ্ট অঙ্কবিদরা এদের বেশ কিছুদিন ভুঙ্ক শেখান।

কিন্তু এ তো ভীষণ অন্যায়।

ক্রিকি বললেন, না, অন্যায় নয়। শারীরিক অসুবিধে ছাড়া এদের তো অন্য কোনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া এরা মহা সম্মানিত। বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সব সময় কিছু ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজন।

এ রকম কত জন আছে?

আছে বেশ কিছু। কারো কারো কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখনো শিখছে।

কত দিন কর্মক্ষমতা থাকে?

পাঁচ থেকে ছবছর। অত্যধিক পরিশ্রমে এদের মস্তিষ্কের নিওরোন নষ্ট হয়ে যায়।।

তাদের দিয়ে কী করা হয় তখন?

সেটা নাই-বা শুনলেন।

কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে বলুন। বৎসরে কত জন এমন বিকলাঙ্গ শিশু আপনারা তৈরি করেন?

সরকারী নিয়মে প্রতিটি মেয়েকে তার জীবদ্দশায় একবার প্রতিভাবান শিশু তৈরির জন্য গামা রশ্মি বিকিরণের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। তবে সবগুলি তো আর সফল হয় না। চলুন যাই অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখি।

আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি দেখলাম, হাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে এক জন হিন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল অন্ধ ছেলেটির কাছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকল, নিনাষ, নিনাষ।

বলুন।

এই হিসাবটা একটু কর। নবম নৈরাশিক গতি ফলকে বৈদ্যুতিক আবেশ দ্বারা আয়নিত করা হয়েছে, পটেনশিয়ালের পার্থক্য ছয় দশমিক শূন্য তিন মাইক্রোভেল্ট। আউটপুটে কারেন্ট কতো হবে?

বারো এম্পিয়ার হবার কথা, কিন্তু হবে না।

লোকটি লাফিয়ে উঠে বলল, কেন হবে না?

কারণ নবম নৈরাশিক একটি ভেক্টর সংখ্যা। কাজেই গতির দিকনির্ভর। ভেক্টরের সঙ্গে স্কেলারের যোগ এভাবে করা যায় না।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। ক্রিকিকে বললাম, আমি এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারি?

ক্রিকি একটু দোমনা ভাবে বললেন, নিশ্চয়ই।

আমি নিনাষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি তোমার বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।

আমার কোনো বন্ধু নেই। চলে যাও এখান থেকে, নয়তো তোমার গায়ে থুতু দেব।

ক্রিকি বললেন, আপনি চলে আসুন। এরা সবাই কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ। আসুন আমরা পদার্থবিদ্যা বিভাগে যাই।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন, আমার মাথা ঘুরছে।

ফ্রিকি আমার হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। অবাক হয়ে দেখি আনার মতো দেখতে মেয়েটি সেই ঘরে হাসিমুখে বসে আছে! তাকে দেখে কেমন যেন ভরসা। হল। সে বলল, এই জায়গা কেমন লাগছে?

ভালো।

নাও, খাবার খাও। এখানকার খাবার ভালো লাগবে খেতে।

টেবিলে বিচিত্র ধরনের রকমারি খাবার ছিল। সমস্তই তরল। যেন বিভিন্ন বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ গুলে রাখা হয়েছে। ঝাঁঝালো ধরনের টক টক লাগল। যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, খুবই সুস্বাদু খাবার। মেয়েটি বলল, তুমি খুব শিগগীরই দেশে ফিরবে।

কবে?

তোমার হিসাবে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে!

কিন্তু কী জন্য আমাকে এখানে আনা হয়েছে? আমাকে দিয়ে তোমরা কী করতে চাও?

মেয়েটি বলল, গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না হয় নি।

তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবেন।

গণিত বিভাগের প্রধানের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আলাপ হল। ফ্রি-কি। আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। গোলাকার একটি ঘরের ঠিক মধ্যিখানে তিনি বসে ছিলেন। ঘরে আর দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। সে ঘরে একটা জিনিস আমার খুব চোখে লাগল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্তই গাঢ় সবুজ রঙে রাঙান। এমন কি যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন, তার রঙ ও গাঢ় সবুজ। আমাকে দেখে ভদ্রলোক অত্যন্ত মোটা গলায় বলে উঠলেন, আমি গণিত বিভাগের প্রধান মিহি। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আমি হকচাকিয়ে গেলাম। অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি। আমার ভেতরটা যেন কেটে কেটে দেখে নিচ্ছে। শক্ত সমর্থ চেহারা-সমস্ত চোখে-মুখে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। তিনি বললেন, ক্রিকি তুমি চলে যাও। আর আপনি বসুন।

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, কোথায় বসব? মেঝেতে?

হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে আমার চেয়ারে বসুন। বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, আমার বসবার তেমন প্রয়োজন নেই। আপনি কী বলবেন বলুন।

আপনি কি জানেন, কী জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে?

না, জানি না।

কোনো ধারণা আছে?

কোনো ধারণা নেই।

বলছি। তার আগে আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি যে ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার বৎসর পাড়ি দিয়েছেন সে সঙ্গন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?

না, আমার কোনো ধারণা নেই।

আপনি যে উপায়ে ভবিষ্যতে চলে এসেছেন সে উপায়ে অতীতেও চলে যেতে পারেন। নয় কি?

আমি ঠিক জানি না। আমাকে নিয়ে কী করা হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি।

বুঝতে না পারলেও খুব অসুবিধে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানুষের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ।

আমি কিছুই জানি না। স্কুলে আমি সমাজবিদ্যা পড়াতাম। বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি একেবারে অজ্ঞ!

আপনাকে বলছি।–মনি দিয়ে শুনুন। মানুষ কিছুই জানে না। তারা সময়কে অতিক্রম করতে পারে না। শূন্য ও অসীম–এই দুইয়ের প্রকৃত অর্থ জানে না। সৃষ্টির আদি রহস্যটা কী, তাও জানে না। পদার্থের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক তার জানা, কিন্তু তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্কটা অজানা। প্রতি-পদার্থ কী তা সে জানে, কিন্তু প্রতি-পদার্থে সময়ের ভূমিকা কী, তা সে জানে না। অথচ জ্ঞানের সত্যিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই সমস্ত রহস্য ভেদ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই সব রহস্য মানুষ কখনো ভেদ করতে পারবে না, তার ফলস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র গন্ডিতে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়া। আপনি বুঝতে পারছেন?

বুঝতে চেষ্টা করছি।

একটা সামান্য জিনিস ভেবে দেখুন, NGK১২৩ গ্রহটিতে মানুষ কখনো যেতে পারবে না। আলোর গতিতেও যদি সে যায়, তবু তাঁর সময় লাগবে এক লক্ষ বৎসর।

সেখানে যাওয়া কি এতই জরুরি?

নিশ্চয়ই জরুরি। অবিকল মানুষের মতো, একচুলও হেরফের নেই।–এ জাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে সেখানে। অপূর্ব সে গ্রহ। মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করেছে তার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য। অথচ মানুষ কখনো তার নাগাল পাবে না। তবে–

তবে কী?

যদি মানুষকে বদলে দেয়া যায়, যদি তাদের মুক্তি দেয়া হয় ত্রিমাত্রিক বন্ধন থেকে, যদি তাদের নিয়ে আসা যায় চতুর্মাত্রিক জগতে–তবেই অনেক কিছু তাদের আয়ত্তে এসে যাবে। তার জন্যে দরকার চতুর্মাত্রিক জগতের মহাজ্ঞানী শক্তিশালী জীবদের সাহায্য। মানুষ অবশ্যি ত্রিমাত্রা থেকে চতুমাত্রায় রূপান্তরের আদি সমীকরণের প্রথম পযায় শুরু করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র মানুষের জন্যে। সে হচ্ছে ফিহা!

ফিহা?

হ্যাঁ, ফিহা। তার অসাধারণ মেধার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি সঠিক পথে এগুচ্ছেন না। এই সমীকরণের দুটি সমাধান আছে। তিনি একটি বের করেছেন, অন্যটি বের করতে চেষ্টা করছেন না।

কিন্তু এখানে আমার ভূমিকাটি কী? আমি কী করতে পারি?

আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। চতুর্মাত্রিক জীবরা ফিহাকে চান। ফিহার অসামান্য মেধাকে তাঁরা কাজে লাগাবেন।

বেশ তো, আমাকে তাঁরা যে ভাবে এনেছেন, ফিহাকেও সেভাবে নিয়ে এলেই তো হয়।

সেই ভাবে নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই তো আপনাকে আনা হয়েছে। সিরানরা পৃথিবীর মানুষদের ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি ২১ থেকে বাঁচানর জন্যে পৃথিবীর চারদিকে শক্তিবলয় ২২ তৈরি করেছে। চতুর্মাত্রিক জীবরা শক্তিবিলয় ভেদ করতে পারেন না, মানুষ যা অনায়াসেই পারে। সেই কারণে ফিহাকে আনা যাচ্ছে না।

আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

ফিঁহাকে নিয়ে আসবেন আপনি সম্ভব না হলে ফিহাকে হত্যা করবেন।

আপনি এসব কী বলছেন!

যান বিশ্রাম করুন গিয়ে, এ নিয়ে পরে আলাপ হবে। যান যান। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

আমি উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। এই মুহূর্তে আমার সেই মেয়েটিকে প্রয়োজন। সে হয়তো অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবে আমাকে। গিয়ে দেখি মেয়েটি কীেচের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রান্ত মানুষেরা যেমন ঘুমোয়, অবিকল তেমনি।

এত নিখুত মানুষ যারা তৈরি করতে পারে তাদের আমার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে হল। এরাই কি ঈশ্বর? সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অমোঘ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে? প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে মহাপুরুষদের কথা আছে, তাঁরা ইচ্ছেমতো মৃতকে জীবন দিতেন। ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। কে জানে হয়তো মহাক্ষমতার অধিকারী চতুর্মাত্রিক জীবদের দ্বারাই এসব

হয়েছে। নকল মানুষ তৈরি করে তাদের দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছে। আনার মতো মানুষ যারা নিখুঁত ভাবে তৈরি করে, তাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

আনাকে ঘুমন্ত রেখেই বেরিয়ে এলাম। উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মনে হল পথ হারিয়েছি। আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে যাব, তার পথ পাচ্ছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিই ভেবে একটা বদ্ধ দরজায় টোকা দিলাম। খুব অল্প বয়স্ক এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত, আসুন, আসুন। আপনার কাছে যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সত্যি বলছি।

আমি হাসিমুখে বললাম, কী করেন। আপনি?

আমি এক জন ডাক্তার।

এখানে ডাক্তারও আছেন নাকি?

নিশ্চয়ই। মস্ত বড় টীম আমাদের। আমি একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। আমরা সবাই মিলে একটা ছোট্ট গবেষণাগার চালাই।

খুব অল্প বয়স তো আপনার!

না না, যত অল্প ভাবছেন তত অল্প নয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া কি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়? বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন, যেন খুব একটা মজার কথা।

জানেন, আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন থেকেই আমি এখানে। একটি দিনের জন্যেও এর বাইরে যেতে পারি নি। সেই বয়স থেকে স্নায়ু নিয়ে কারবার আমার। বাজে ব্যাপার।

তার মানে এই দীর্ঘ সময়ে একবারও আপনি বাবা-মার কাছে যান নি?

না। এমনকি আমার নিজের গ্রহটি সত্যি দেখতে কেমন তাও জানি না। তবে শুনেছি সেটি নাকি অপূর্ব। বিশেষ করে রাতের বেলা। অপূর্ব সব রঙ তৈরি হয় বলে শুনেছি। তাছাড়া দিন-রাত্রি সব সময় নাকি হুঁ হুঁ করে বাতাস বইছে। আর সেখানকার ঘরবাড়ি এমনভাবে তৈরি যে একটু বাতাস পেলেই অপূর্ব বাজনার মতো আওয়াজ হয়।

আপনি কি কখনো যেতে পারেন না সেখানে?

ডাক্তার অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কী করে যাব? আমাদের এই সম্পূর্ণ গবেষণাগারটি একটি চতুর্মাত্রিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

তার মানে?

একটা ডিম কল্পনা করুন। কুসুমটি যেন আমাদের গবেষণাগার, একটি ত্রিমাত্রিক জগৎ। ডিমের সাদা অংশটি হল চতুর্মাত্রিক জগৎ এবং শক্ত খোলটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় গ্রহ টাইফা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম করা হল কেন?

চতুর্মাত্রিক জীবদের খেয়াল। তবে আপনাকে একটা ব্যাপার বলি শুনুন, ঐ সব মহাপুরুষ জীবদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সমস্ত ত্রিমাত্রিক জগৎ বিলুপ্ত করা। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই গবেষণাগার। বুঝতে পারছেন?

না।

না পারলেই ভালো।

আপনি কি এসব সমর্থন করেন না?

না।

কেন করব? আমি বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর কিছু কিছু রাখি। আমি জানি ফিহা ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। অসম্ভব মেধা তাঁর। সমীকরণের সমাধান হওয়ামাত্র চতুর্মাত্রিক জগতের রহস্যভেদ হয়ে যাবে মানুষের কাছে, বুঝলেন? আর এতেই মাথা ঘুরে গেছে সবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা ফিহাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু কলা। কাঁচকলা! ফিহাকে আনতে গিয়ে কাঁচকলাটি খাও।

আমি লক্ষ করলাম ডাক্তার ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, মানুষেরা পৃথিবীর চারিদিকে শক্তিবলয় তৈরি করেছে। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জীবদেরও সাধ্য নেই, সেই বলয় ভেদ করে। হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসি থামলে কাতর গলায় বললাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে। আমায় আমার ঘরটি দেখিয়ে দেবেন? আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবসান ভাবে হাঁটছি। কী হতে যাচ্ছে কে জানে। আবছা আলোয় রহস্যময় লম্বা করিডোর। দুই পাশের প্রকান্ড সব কামরা বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অথচ এদের কোনো কিছুর সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আমি আমার জায়গায় ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার স্ত্রী আছে, আমার দুটি অবোধ শিশু আছে–দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে অবোধ ভালোবাসা আছে।

পরবর্তী দু দিন, অনুমানে বলছি–সেখানে পৃথিবীর মতো দিন-রাত্রি নেই, আমার ওপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। একেক বার একেকটি ঘরে ঢুকি। বিকট সব যন্ত্রপাতি আমার চারপাশে বসান হয়। তারপর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই অন্যটি শুরু। বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস ফেলার অবসর টুকু নেই। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী হবে প্রশ্ন করে? নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি ভাগ্যের হাতে! ক্লান্তিতে যখন মরমর হয়েছি, তখন বলা হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখন চর্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর আমাকে পাঠান হবে পৃথিবীতে।

সমস্ত দিন ঘুমালাম। ঘুম ভাঙলি দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনে। গণিত বিভাগের একটি ছেলে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কিছু বলবে, খুব জরুরি। রোগামতো লোকটি খুব নিচু গলায় বলল কথাগুলি।

আমি বললাম, কে সে?

নিনাষ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। আমার মনে হল কিছু একটা হয়েছে, থমথমে ধর্মছে চারদিক। আনার মতো মেয়েটিও নেই কোথাও।

সবাই যেন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি যেতেই উৎসুক হয়ে নড়েচড়ে বসল। সবাই। তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে?

নিনাষ বলল, হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, টাইফা গ্রহ অদৃশ্য হয়েছে?

আমি কিছুই জানি না।

তাহলে আমার কাছ থেকে জানুন। অল্প কিছুক্ষণ হল সমস্ত গ্রহটি চতুর্মাত্রিক গ্রহে পরিণত করা হয়েছে। কেমন করে জানলাম? ত্রিমাত্রিক গ্রহকে চতুমর্হত্রিক গ্রহে পরিণত করার নির্দিষ্ট হিসোব আমরা করেছি। আমরা সব জানি। শুধু যে টাইফা গ্রহই অদৃশ্য হয়েছে তাই নয়, একটি বৃত্তাকার স্থান ক্রমশই চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং আপনার পৃথিবী সেই বৃত্তের ভিতরে। বুঝলেন?

আমি বললাম, আমার তাহলে আর প্রয়োজন নেই?

এই মুহুর্তে আপনাকেই তাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই। নিশ্চয় তারা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেষ্টা করবে।–ফিহার মতো বিজ্ঞানী যেখানে

আছেন। আমি খুব ভালো করে জানি, মহাজ্ঞানী ফিহা একটা বুদ্ধি বের করবেনই। যাক, ওসব ছেড়ে দিন। আপনাকে কী জন্যে পাঠান হবে জানেন?

না।

আপনাকে পাঠান হবে, যেন ফিহা পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে না পারেন, তাই দেখতে। ফিহার যাবতীয় কাগজপত্র আপনাকে নষ্ট করে ফেলতে বলবে। এমন কি প্রয়োজন হলে আপনাকে বলবে ফিহাকে হত্যা করতে। কিন্তু শুনুন, তা করতে যাবেন না। বুঝতে পারলেন? টাইফা গ্রহ চলে গেছে–পৃথিবী যেন না যায়।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আনা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে বলল,

সুসংবাদ। তুমি অল্প কিছুক্ষণের ভিতর পৃথিবীতে যাবে। তোমাকে কী করতে হবে তা মিহি বুঝিয়ে বলবেন।

আনা, চতুর্মাত্রিক জীবরা যখন তোমার মতো মানুষ তৈরি করতে পারে, তখন ওদের পাঠালেই পারত। পৃথিবীতে, ওরাই করতে পারত যা করার।

তৈরি মানুষ শক্তিবিলয় ভেদ করতে পারে না।

কিন্তু আনা, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে তা আমি করব না।

নিনাষ কিছু বলেছে তোমাকে, না? ঠিক সে জন্যে নয়।

আমার মন বলছে আমি যা করব তা অন্যায়।

বাজে কথা রাখ–তুমি করবেই।

আমি করবই? যদি না করি?

না করলে ফিরে যেতে পারবে না তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছে খুব সহজ সত্য। তুমি কি তোমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে চাও না?

চাই।

তা ছাড়া আরেকটা দিক ভেবে দেখ! তোমার তো কিছু হচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ শেষ করে পৃথিবীতে নিজের ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাবে। তারও পাঁচ হাজার বছর পর পৃথিবীর পরিবর্তন হবে। তার আগে নয়। এস, মিহির কাছে যাই, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। ও কি, তুমি কাঁদছ নাকি?

না, আমি ঠিক আছি।

৫. বইটি অর্ধসমাপ্ত

বইটি অর্ধসমাপ্ত। এরপর আর কিছু নেই। উত্তেজনায় মাথুর হাঁপাতে লাগলেন। সেই মেয়েটি কোথায়, যে তাকে এই বইটি দিয়ে গেছে? তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন। মাথুর ঘরের বাতি নিভিয়েই বেরিয়ে এলেন। বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। ঘুমন্ত সিরান-পল্লীর ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে নির্জন পথ। মাথুরের অল্প শীত করছিল। মেয়েটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন। দরজায় টোকা দিতেই লী বলল,

কে?

আমি। আমি মাথুর।

লী দরজা খুলে দিল। মাথুর খুব ঠান্ডা গলায় বললেন,

বইটির শেষ অংশ কোথায়?

শেষ অংশ আমি পাই নি। আমি তনুতন করে খুঁজেছি।

মাথুর ধীরে ধীরে বললেন, লোকটি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে যেতে পেরেছে। তার মানেই হল সে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। অর্থাৎ তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে। সহজ কথায় ফিহাকে পৃথিবী রক্ষার কোনো পরিকল্পনা করতে দেয় নি। ফিহাকে আমাদের বড্ডো প্রয়োজন।

মাথুর আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলেন, এক সময় নিঃশব্দে উঠে এলেন।

নিকি ঘরে ঢুকে থমকে গেল।

সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে ফিহা শুয়ে আছেন। নটার মতো বাজে। এই সময় তিনি সাধারণত আঁক কষেন, নয়তো দুলেন্দুলে বাচ্চাদের মতো বই পড়েন। নিকি বলল, আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?

ফিহা বললেন, শরীর নয়, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল সারারাত আমি ভূত দেখেছি।

ভূত?

ভূত! হ্যাঁ, জ্বলজ্যান্ত ভূত। মানুষের গলায় কথা বলে। বাতি জ্বললেই চলে যায়। আবার ঘর অন্ধকার করলে ফিরে আসে। অদ্ভুত ব্যাপার। সকালবেলা শুয়েশুয়ে তাই ভাবছি।

নিকি বলল, রাত-দিন অঙ্ক নিয়ে আছেন। মাথাকে তো আর বিশ্রাম দিচ্ছেন না, সেই জন্যে এসব হচ্ছে। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করুন; এক জন ডাক্তার আনব?

না না, ডাক্তার-ফাক্তার লাগবে না। আর বিশ্রামের কথা বলছ? সময় তো খুব অল্প। যা করতে হয়। এর ভেতর করতে হবে।

নিকি দেখল, ফিহা খুব সহজভাবে কথা বলছেন। সাধারণত দুটি কথার পরই তিনি রেগে যান। গালিগালাজ করতে থাকেন। রাগ খুব বেশি চড়ে গেলে হাতের কাছে যে কাগজটা পান তা কুচিকুচি করে ফেলেন। রাগ তখন একটু পড়ে। নিকি ভাবল, রাতে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে, যার জন্যে আজ ফিহার গলায় এরকম নরম সুর। নিকি চেয়ারে বসতে বসতে বলল, কী হয়েছিল ফিহা! ভূতটা কি আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল?

না, ভয় দেখায় নি। বরং খুব সম্মান করে কথা বলেছে। বলেছে, এই যে চারিদিকে রব উঠেছে মহাসংকট, মহাসংকট–এসব কিছু নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর ডাইমেনশন বদলে যাবে, আর নতুন ডাইমেনশনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবর্ণ সুযোগ! এবং সেখানে নাকি আমার মতো বিজ্ঞানীর মহা সুযোগ-সুবিধা। কাজেই আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে এই মহাসংকট কেটে যায়। এই সব।

আপনি তার কথা শুনে কী করলেন?

প্রথমে কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়ে মেরেছি। তার দিকে। তারপর ছুঁড়ে মেরেছি এ্যাসট্রেটা। এতেও যখন কিছু হল না, তখন বাতি জ্বলিয়ে দিয়েছি।

নিকি অবাক হয়ে বলল, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। সত্যি কি কেউ এসেছিল?

আরে না। আসবে আবার কি? ত্রিমাত্রিক জগৎকে চতুর্মাত্রিক জগতে পরিণত করবার জন্যে আমি এক সময় কতকগুলি ইকোয়েশন সমাধান করেছিলাম, জান বোধ হয়? গত কয়েক দিন ধরেই কেন জানি বারবার সে কথা মনে হচ্ছে। তাই থেকে এসব দেখছি। মাথা গরম হলে যা হয়। বাদ দাও ওসব। তুমি কি চা দেবে এক কাপ?

আনছি, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

রাত্রি জাগরণের ফলে ফিহা সত্যি সত্যি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন, আজ সমস্ত দিন কাজ করবেন এবং সমস্ত দিন কোনো খাবার খাবেন না। ফিহো সব সময় দেখেছেন যখন তাঁর পেটে এক কণা খাবার থাকে শ1, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসান হয়ে আসে, তখন তাঁর চিন্তাশক্তি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। বিস্ময়কর যে কয়টি আবিষ্কার তিনি করেছেন, তা ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই করেছেন। আজ অবশ্যি কিছু করা গেল না। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিকি সকালের খাবার দিয়ে যায় নি। গত রাতে যদি এই জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপার গুলি না। ২ত তাহলে এতক্ষণে কাজে লেগে পড়তেন।

এই নিন চা। আমি সঙ্গে কিছু বিস্কিটও নিয়ে এসেছি।

খুব ভালো করেছ। নিকি একটু ইতস্তত করে বলল, ফিহা, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বল, বল।

আগে বলুন আপনি হাসবেন না?

হাসির কথা হলেও হাসব না?

হাসির কথা নয়। আমি–মানে আমার মনে কদিন ধরেই একটা ভাবনা হচ্ছে, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।

ফিহা বললেন, বলেই ফেল। কোনো প্রেমের ব্যাপার নাকি?

না না, কী যে বলেন! আমার মনে হয় আমরা যদি পৃথিবীটাকে সরিয়ে দিতে পারি তার কক্ষপথ থেকে, তাহলে বিপদ থেকে বেচে যেতে পারি। নয় কি?

ফিহা হো হো করে হেসে ফেললেন। নিকি বলল,

কেন, পৃথিবীটাকে কি সরান যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। তুমি যদি মঙ্গল গ্রহটা পরম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে গুড়িয়ে দাও, তাহলেই সৌরমন্ডলে মধ্যাকর্ষণজনিত সমতা ব্যাহত হবে। এবং পৃথিবী ছিটকে সরে যাবে।

তা হলেই তো হয়। পৃথিবীকে নিরাপদ জায়গায় এই করে সরিয়ে নিলেই হয়।

কিন্তু একটা গ্রহ উড়িয়ে দিলে যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে। আর পৃথিবীকে অল্প একটু সরালেই তো জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ধর, পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে এগিয়ে আসে, তাহলেই উত্তাপে সুমেরু-কুমেরুর যাবতীয় বরফ গলে মহাপ্লাবন। আর সূর্য থেকে একটু দূরে সরে গেলে শীতে আমাদের শরীরের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত জমে যাবে। বুঝলে?

নিকির চেহারা দেখে মনে হল সে ভীষণ। হতাশ হয়েছে। ফিহা চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি এখন আর তার নেই! নিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নিজেও একটু উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। নিকির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি, প্রতিটি মেয়ে পৃথিবী রক্ষার জন্যে একএকটি পরিকল্পনা বের করে ফেলেছে। ট্রেনে আসবার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা, সেও নাকি কী বই পেয়েছে কুড়িয়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বই–তাতেও নাকি পৃথিবী কী করে রক্ষা করা যায় তা লেখা আছে। হা-হা-হা।

নিকি চুপ করে রইল। বেচারী বেশ লজ্জা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠেছে চোখমুখ। ফিহা বললেন, নিকি, তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছে?

না।

এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, তোমরা সবাই কিছু-না-কিছু ভাবছ। আমার ভেতর কোনো রকম ভাবালুত নেই। তবু তোমাদের এসব কান্ডকারখানা দেখে মনে হয়, যে পৃথিবীর জন্যে সবার এত ভালোবাসা–তা নষ্ট হয় কী করে!

নিকি বলল, আপনি কিছু ভাবছেন ফিহা?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠান্ডা মাথায় ভাববার জন্যেই তো এমন নির্জন জায়গায় এসেছি। আমি প্রাণপণে বের শরতে চেষ্টা করছি কী জন্যে এমন হচ্ছে। সেই বিশেষ কারণটি কী হতে পারে, যার জন্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। যেই মুহুর্তে কারণ জানা যাবে, সেই মুহূর্তে পৃথিবী রক্ষার উপায় একটা কিছু হবেই। আমার বয়স হয়েছে, আগের মতো খাটতে পারি না, তবু মাথার ধার একটুও ভোঁতা হয় নি। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে।

আবেগে নিকির চোখে পানি এল। ফিহার চোখে পড়লে তিনি রেগে যাবেন, তাই সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটু আসছি।

ফিহা ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে সিগারেট জ্বলিছে। হেটে বেড়াচ্ছেন ঘরের ভেতর। মনে মনে বলছেন, কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু কী করে সেই কিছু একটা হবে, তাই ভেবে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে হাতড়ানর কোনো মানে হয় না। ফিহা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, নিকি।

নিকি দৌড়ে এল ফিহা বললেন, আমি মাথুরের সঙ্গে একটু আলাপ করি, কী বল? ঐ মেয়েটা কী কান্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই। আমি এক্ষুণি যোগাযোগ করে দিচ্ছি।

মাথুরের চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। লীর নিয়ে আসা বইটির শেষ অংশ নেই, এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এদিকে ফিহার কোনো খোঁজ নেই। সিরান-পল্লীর বিজ্ঞানীরা তাঁকে বয়কট করেছেন। কাজকর্ম চালাচ্ছে স্রুরা। স্রুরা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, মাথুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সমস্তই মাথুরের কানে আসে। মহাকাশ প্রযুক্তি-বিদ্যা গবেষণাগারের তিনি মহাপরিচালক, অথচ তাঁর হাতে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

মাথুর সময় কাটান শুয়ে শুয়ে। নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা মনেও হয় না। তাঁর। দশ থেকে পনেরটি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়েন। কাজ বলতে এই। রাতের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঘুমুতে যান। ঘুম হয় না, বিছানায় ছটফট করেন।

সেদিনও খবরের কাগজ দেখছিলেন। সরকারী নির্দেশ থাকার জন্যেই কোথাও মহাবিপদের কোনো উল্লেখমাত্র নেই, অথচ সমস্ত খবরের মূল কথাটি হচ্ছে, বিপদ এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে। পাতায় পাতায় লেখা, শহরে আইনশৃঙ্খলা নেই, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচল বন্ধ, কল-কারখানার কর্মীরা কাজ ছেড়ে বিনা নোটিশে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ছয় জন তরুণী আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেছে। পড়তে পড়তে মাথুরের মনে হল তিনি নিজেও কি আত্মহত্যা করে বসবেন কোনো দিন?

ট্রিইই, ট্রিইই। যোগাযোগের স্বচ্ছ পদা নীলাভ হয়ে উঠল। মাথুর চমকে তাকালেন সেদিকে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে কে কথা বলতে চায়?

মাথুর, আমি ফিহা বলছি। কেমন আছ তোমরা?

মাথুর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। পাওয়া গেছে, ফিহাকে পাওয়া গেছে।

মাথুর, লী বলে সেই পাগলা মেয়েটি এসেছিল?

জ্বি এসেছিল।

সে কি এখনো আছে তোমার কাছে?

না, সে চলে গেছে। ফিহা, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিল।

কী কথা? আমি এখন একটু ব্যস্ত।

শত ব্যস্ত থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কি ইদানীং কোনো আজগুবি ব্যাপার দেখেছেন, কেউ এসে কি আপনাকে ভয়টয় দেখাচ্ছে?

ফিহা একটু অবাক হলেন। থেমে থেমে বললেন, তুমি জানলে কী করে! নিকি কি এর মধ্যেই তোমাকেও এসব জানিয়ে বসে আছে?

না না, নিকি নয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। আপনাকে সব বোঝান যাবে

না। তা ছাড়া সময়ও খুব কম।

বেশ, তাহলে জরুরী কথাটাই সেরে ফেল।

আপনি ত্রিমাত্রিক সময় সমীকরণের সমাধান করেছিলেন?

করেছিলাম, তা তো তোমার মনে থাকা উচিত।

মনে আছে ফিহা। কিন্তু আপনার সমীকরণের দুটি সমাধান ছিল।

দুটি নয় একটি। অন্যটিতে ইমাজিনরি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছিল, কাজেই সেটি বাদ দিতে হবে। কারণ এখানে সমাধানটির উত্তর ও ইমাজিনারি টার্মে এসেছিল।

ফিহা, আমাদের দ্বিতীয় সমাধানটি দরকার?

কেন?

দ্বিতীয় সমাধানটি সঠিক সমাধান।

মাথুর, একটা কথা বলছি, রাগ করো না।

বলুন।

তোমার মাথায় দোষ হয়েছে। বুঝতে পারছি, এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা খুব মুশকিল।

আমার মাথা খুব ঠিক আছে। আমি আপনার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুনুন।

বেশ বেশ বল।

দ্বিতীয় সমাধানটি যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা নিজেরাই একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করতে পারি।

হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। কিন্তু সমাধানটি তো ভুল।

সমাধানটি ভুল নয়। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। আচ্ছা ফিহা, ধরুন। এক দল বিজ্ঞানী একটি নির্দিষ্ট পথের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রকে চতুমাত্রায় পরিবর্তিত করছেন, এখন তাঁদের আমরা আটকাতে পারি, যদি সেই পথে আগেই আমরা একটি চতুর্মাত্রিক জগৎ তৈরি করে রাখি।

মাথুর, তোমার কথায় আমি যেন কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি। মাথুরা, এসব কী বলছ?

আমি ঠিক কথাই বলছি ফিহ। আপনি কি সমাধানটি নিজে এখন একটু পরীক্ষা করবেন?

ফিহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি করছি, আমি এক্ষুণি করছি। আর তুমি নিজেও করে দেখ, স্রুরাকে বল করে দেখতে। সমাধানটি লিখে নাও।

ফিহা একটির পর একটি সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন।

মাথুর এক মনে লিখে চললেন। দু জনের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছে।

৬. ভালোবাসার নীল আলো

সন্ধ্যা হয় নি তখনো, শেষ বিকেলের লালচে আলো গাছের পাতায় চিকচিব করছে। ফিহা বারান্দায় চেয়ার পেতে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিকাল হলেই তাঁর মনে এক ধরনের বিষণ্ণ অনুভূতি হয়।

নিকি চায়ের পেয়ালা হাতে বাইরে এসে দেখে, ফিহা ভু কুচকে দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তাঁর রূপালি চুল তিরতির করে উড়ছে। নিকি কোমল কণ্ঠে ডাকল, ফিহা।

ফিহা চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন, নিকি! আমার মনে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অর্থহীন।

নিকি কিছু বলল না, চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। ফিহা বললেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান তো মানুষের জন্যে, আর একটি মানুষ কতদিন বাঁচে? তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সব সম্পর্কের ইতি। ঠিক নয় কি?

নিকি শক্ত মুখে বলল, না ঠিক নয়। ফিহা চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। একটু অস্বস্তির সাথে নিকি বলল, দেখুন ফিহা, আপনার সাথে তর্ক করা আমার সাজে না। কিন্তু নবম গণিত সম্মেলনে আপনি একটা ভাষণ দিয়েছিলেন–।

কী বলেছিলাম। আমার মনে নেই।

বলেছিলেন, মানব জাতি জন্মমুহূর্তেই একটা অত্যন্ত জটিল অঙ্ক কষতে শুরু করছে। এক-এক যুগে এক-এক দল মানুষ এসেছে, আর সে জটিল অঙ্কের এক একটি ধাপ কষা হয়েছে। অজানা নতুন নতুন জ্ঞান মানুষের ধারণায় এসেছে।

বেশ।

আপনি বলেছিলেন, একদিন সে অঙ্কটির সমাধান বের হবে। তখন সব রহস্যই এসে যাবে মানুষের আওতায়। বের হয়ে আসবে মূল রহস্য কী। মানুষের ছুটি হচ্ছে সেই দিন।

ফিহা বললেন, এইসব বড় বড় কথা অর্থহীন নিকি।

নিকি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এলোমেলোভাবে বসে থাকা ফিহাকে লক্ষ করল। তারপর বলল, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ফিহা?

না নিকি, আজ আমার মতো সুস্থ আর কেউ নেই। একটু থেমে অন্যমনস্ক স্বরে ফিহা বললেন, পৃথিবী রক্ষার উপায় বের হয়েছে নিকি। পৃথিবী এবারেরও বেঁচে গেল।

ফিহা বসে বসে সন্ধ্যা মিলান দেখলেন। চাঁদ উঠে আসতে দেখলেন। তাঁর মনে হল, এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রকৃতিকে তিনি কখনো দেখেন নি। তাঁর কেমন যেন বেদনাবোধ হতে লাগল।

যাবতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনে সুপ্ত বেদনাবোধ জাগিয়ে তোলে কেন কে জানে! এক সময় নিকি ভিতর থেকে ডাকল, ফিহা ভিতরে এসে পড়ুন। ভারি ঠান্ডা পড়েছে।

ফিহা নিঃশব্দে উঠে এলেন। চাবি ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললেন, আবার–আবার এসেছ তুমি?

ভৌতিক ছায়ামূর্তি অন্ধকারে দৃশ্যান হয়ে উঠেছে। তার হাতে অদ্ভুত একটি সুঁচাল যন্ত্র। সে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ফিহা।

আমি তখনি ক্ষমা করব, যখন তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু ফিহা, আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে আজ আসি নি।

তবে কী জন্যে এসেছ?

আপনাকে হত্যা করতে।

ফিহা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তাতে তোমার লাভ?

তাহলেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যেতে পারব।

ফিহা মৃদু গলায় বললেন, ঠিক আছে। কীভাবে হত্যা করবে?

আমার কাছে শক্তিশালী রেডিয়েশন গান আছে মহামান্য ফিহা।

ফিহি জানালা খুলে দিলেন! বাইরের অপরূপ জোছনা ভাসতে ভাসতে ঘরের ভেতর চলে এল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিহা অভিভূতের মতো বললেন, দেখ দেখ, কী চমৎকার জোছনা হয়েছে!

ছায়ামূর্তির রেডিয়েশন গানের অগ্নিঝলক সেই জোছনাকে স্নান করে দিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। আবার সেই উথাল-পাথাল আলো আগের মতোই নীরবে ফুটে রইল।

———–––

পরিশিষ্ট

পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় নি।

স্রুরার কথা তো আগেই বলেছি। অসাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সন্মানসূচক এক লালতারা পেয়েছিলেন খুব কম বয়সেই। শেষ পর্যন্ত তিনিই ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

আর সেই স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় অন্ধ যুবকটি? চুতর্মাত্রিক জগতের জীবরা যাকে পাঠাল ফিহাকে হত্যা করার জন্যে?

না, তার উপর পৃথিবীর মানুষের কোনো রাগ নেই। তার লেখা থেকেই তো মাথুর জানলেন। ফিহার চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণটি, যা তিনি ভুল ভেবে ফেলে রেখেছিলেন—তা ভুল নয়।

আর তার সাহায্যেই তো চতুর্মাত্রিক মহাপ্লাবন রোধ করা গেল।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে।

কত নতুন জ্ঞান, নতুন পথ, আপনি এসে ধরা দিয়েছে মানুষের হাতে। এখন শুধু ছুটে চলা, জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টির মূল রহস্যের দিকে। ফিহার মত নিবেদিত প্রাণ বিজ্ঞানীরা কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছেন। কবে মানুষ বলবে,

তোমাদের আত্মত্যাগ মানুষদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমাদের সাধনা আমরা ভুলি নি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি। আমাদের কাছে কোনো রহস্যই আর রহস্য নয়।

ঠিক সন্ধ্যাবেল পুবের আকাশে যে ছোট্ট তারাটি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে নীল আলো জ্বেলে আপনিতেই নিভে যায়, পৃথিবীর মানুষ সেটি তৈরি করেছেন ফিহার স্মরণে। সেই কৃত্রিম উপগ্রহটির সিলঝিন নির্মিত কক্ষে পরম যত্নে রাখা হয়েছে ফিহার প্রাণহীন দেহ। সে সব কতকাল আগের কথা।

আজও সে উপগ্রহটি ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর চারিদিকে। হিসেব মতো জ্বলে উঠছে মায়াবী নীল আলো। পৃথিবীর মানুষ যেন বলছে, ফিহা, তোমাকে আমরা তুলি নি, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা তোমাদের জন্যে। ভালোবাসার নীল আলো সেই জন্যেই তো জ্বলে রেখেছি।